যাদুকরী

যাদুকরী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরমপ্রীতিভাজন—

শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিকের

করকমলে

লাভপুর, বীরভূম

কার্ত্তিক, ১৩৪৯।
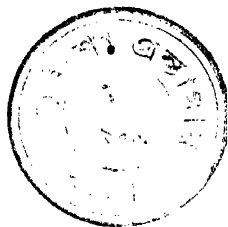
যাদুকরী

শরতের নির্ম্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পূজোর আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পরিপূর্ণতায় চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্ম্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জনচারেক বাজীকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজীকর একটা বিচিত্র জাতি। বাংলা দেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্ম্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন্ জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুল-পঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর

মালা পরণে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশ বিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরণে সৌখীন-পাড় শাড়ী, হাতে একহাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিল্টীর চুড়ী, গলায় গিল্টীর হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ী, এখন পরে গিল্টীর ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরাণো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর ; নাচও তাই—বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রূপো দিলে নির্ব্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না। দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরীর বাজীকরের মনের ছন্দ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না ; দল দূরের কথা—স্বামীস্ত্রীতে এক সঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রাণী, চাঁদবদোনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুর্জ্জেগিন্নী তরকারীর বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়াছিল কন্যা রমা, বিষণ্ণ নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তিভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় করতো, পূজো এলো আর এই হল বাজীকরের আমদানী।

—নাচন দ্যাখেন মা, গান শোনেন। কই আমাদের রমা ঠাকরণ কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে।

—বালাই! ষাঠ! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনকার দুঃখ কিসের—

—বকিসনে বলছি। এমন হারামজাদা জাত তো কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুইই দে তো ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজীকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরণ।

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে ভিক্ষে নে।

—কোন্ মাসে বিয়া হল ঠাকরণ? কোথা হল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ'।

—ওরে বাপরে। তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি!

দিদি ঠাকরণের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব—গান শুনাব, শিরোপা নিব। কাঁখালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল—কাপড় নিব, গয়না নিব, রমা দিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝম্‌ঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোণারূপো বাতিল হল কাঁদছে বসে স্যাকরাণী।
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানী।
উর-র-র জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজীকরীর সর্ব্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দুজনের বিষণ্ন মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ীর এবং পাশের বাড়ীর মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজীকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুল ঢুল করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান।

পাড়ার যত এয়োস্তীরি—শাঁখা ফেলে
পরছে চুড়ি---
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা' তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যজ্য করব
এ ঘর বাড়ী
নয়কো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো,
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে ফেলব চোখের
নোনা পানি।

উরর-জাগ-জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজীকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—মরণ!

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভাল গো ঠাকরণ। রমা দিদি চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড় গয়না নিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল? চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম করে লিখ।

রমা বা গিন্নী কোন কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল—তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

—র্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বরং লিয়ে আসব—নাকে দড়ি দিয়া বেঁধে রমা দিদির দরবারে।

মরণ! ও-পাড়ায় যেতে আবার 'র‍্যাল ভাড়া' লাগে নাকি?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল:—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া না কি?

—ঢং করছে! কিছু জানিস না না কি?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।

বাজীকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয় ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্ব্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর দেবুকে জানিস?

চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—খোকাবাবু? কলকাতায় কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ, শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ, —লল্‌ছা'পারা বাবুটি?

—হ্যাঁ।

—অ-মাগ! আমি কুথা যাব গ! মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—বুঝল ঠাকরণ, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতম ই লক্ষ্মী ঠাকরণটি কার গলায় মালা দিবে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জে গিন্নী বলিলেন—থাম বাবু

তুই, আদিখ্যেতা করিস নে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে আমি বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেনে মা? মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে! রমা দাঁড়াইয়াছে দূরে, নতমুখে। না দেখিয়াও চতুরা বাজীকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

*　　　*　　　*　　　*

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট সহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং সহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে বাপ-মায়ের আদরের দুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘর জামাইকেও মুখুজ্জে কর্ত্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভাল। স্বরূপ সুন্দর ছেলে, বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ. পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা-মূলা হইতে রান্না-করা তরকারী পর্য্যন্ত যাহা নিজেদের ভাল লাগিবে—তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়ীতে একবেলা থাকিবে বাপের বাড়ীতে—এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারী উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদই চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্নে মুখুজ্জেবাড়ীর ঝি আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ আসিয়াছিল বাড়ী। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন—দেবু বাড়ী এসেছে আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন? গরীব বলে কি দুধও খাওয়াতে পারিনে আমি বেটার বউকে! বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝি-টা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

—না-না-না! রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ি জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়ীতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলি পথে পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জে বাড়ী হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই হে দেবুর মা! দেবুর

আজ নেমন্তন্ন ওবাড়ীতে! শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।"

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এস বস।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়ীতে। খেয়ে দেয়ে বউ-বেটা তোমার ও-বাড়ীতেই আজ থাকবে; কাল সকালে আসবে।

বাঁড়ুজ্জে গিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হ'লে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা ব'লে যাও।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ীর কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই! শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভাল লাগে নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়ীতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন—দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া

তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন। উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র পর্য্যন্ত লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন—ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন—ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোষ আদায়ের আর্জ্জি পর্য্যন্ত মুসাবিদা করিতে সুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে কর্ত্তা ব্যবসা-বাণিজ্যে মহাজনী লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে কর্ত্তা আজীবন মাষ্টারী করিয়াছেন—রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার, ভাঙামূর্ত্তি, পুরাণো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটিকে সচেতন করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জে গিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের?

—হাসি নাই? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরুণ? বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি!

—হাসি তামাসা পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল!
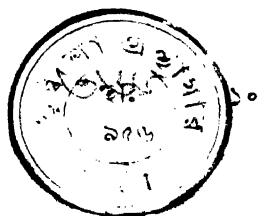
তাহার দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুদ খাটবে নাই ঠাকরণ!

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না? কেন?

—রাগ কর নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরণ। আমার ওষুদ লিতে হবে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

স্নান করা লয় ঠাকরণ; পরিষ্কারের অনেক করণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশ বিন্যেস করতে হবে, চলকো করে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা! গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্ত্তার হাতে দিবা। দেখ পারতো এলাচ আন আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি।

স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন, ছোট এলাচ দারচিনি, বড় এলাচ: মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি ক'রে পান সাজবা, নিজে খাবা; খেয়ে কর্ত্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটী সুপারী সিঁদুর—আর পুরাণো কাপড় একখানি। লিয়ে এস।

*　　*　　*　　*

বাজীকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

যাদুকরী

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজীকর পুরুষ বাজী দেখাইতেছে।

—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেল্কী লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপ টুপিয়ে—! বাহারে বেটা—বাহারে!—

একটা বাটীর জলে একটা কাঠের হাঁস—ক্রমাগত ডুবিতেছিল আর উঠিতেছিল।

হাঁ—হাঁ বেটা আর ডুবিস না, সর্দ্দি লাগবে জ্বর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, ক্ষিধায় জ্বলছে পেট, ঘুর‍্যা পরছে মাথা। প্যাঁক প্যাঁকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জেল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজীকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল।—ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাঁক পেঁকিয়ে—! দোহাই ভাটরাজার দোহাই! সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতেই দেখা গেল কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে ঠোঁট দিয়া সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না! বাজীকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরুণী! এই! থানার বারান্দায় বসিয়াছিল কয়েক জন

পুলিশ কর্ম্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিল। জনকয়েক বসিয়াছিল বারান্দায়। একজন ডাকিল—এই বাজকরুণী! এই!

বাজীকরী আসিয়া কাঁখালের ঝুড়িটি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।—পেণাম দারোগাবাবু!

তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজীকরী দেখিল, তাহার চেনা বড়দারোগা ও ছোটদারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজীকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্ত্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাকীর জামা দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড়দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপুনি ই-থান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, লতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!

উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে? মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তোরা হারামজাদীরা পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধর‍্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপরে!

বাজীকরী দুই হাত তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উর-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জারঘিনি না—

সরু কাপড় নক্সিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—

গোট পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয়না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনেস্টবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতেই তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল—বল, কি বলছ!

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে! এরা এসেছে ভরতপুর থেকে দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—কিসের লেগে এলে তুমরা?

—কাজ আছে, পুলিশের কাজ।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি?

কনেস্টবলটিও হাসিল।

বাজীকরী তাহার গা ঘেঁসিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু?

কনেস্টবলটা তাহার মুখের দিকে চাহিল;—মদিরদৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া! এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত—

হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা
কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা!
উর র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—;

আগন্তুক কনেস্টবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস লাগর, আর লয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা!

—তুমি কিন্তুক লোক ভাল নয়।

—কেন?

—বল না কথাটা! মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল।

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ-নির্মল নীল আকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্বর ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের প্রখরতর বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগতবর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্য্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজীকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়ীতে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে। বাঁড়ুজ্জে বাড়ীতে সেই বাজীকরী, আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হ'ল মা ঠাকরণ। বাবুদের সেবা হ'ল? পড়ল পাতার এঁটোকাঁটা?

বাঁড়ুজ্জে গিন্নী বলিলেন—বস্ বস্, চেঁচাস নে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন!

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটা ফিক্ করিয়া হাসিল, বলিল—আপনকার ভিতরটা পাথরে গড়া!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটীর মাথা খাব বাবু!

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো! বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই পণ!

কথাবার্ত্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যালা বাজকরুণী গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোন ওর কাছে।

বাঁড়ুজ্জে কর্ত্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজীকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধুলা।

—হুঁ! সাপ আছে? বাজী দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তরতন্তর ওষুদপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বারবার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপরে! দেবতা আমাদের! ভগবান আমাদের! এখনও জমি খাই, দোহাই দিয়ে বাজী দেখাই!

মৃদু হাসিয়া কর্ত্তা বলিলেন—ভাটরাজ নয়। তাঁর নাম হ'ল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস? সীথল গাঁ—নয় সিদ্ধল, সিদ্ধল!

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—

বলি হ্যাঁগা ! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি ? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিদ্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন—তিনি—

—এই দেখ, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব ?

কর্ত্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না ; সীথল গ্রামের নাম 'সিদ্ধল', ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট ! সে বলিল—কর্ত্তাবাবু—আপনি এত কি কর‍্যা জানলা গো ?

গিন্নী বলিলেন—বউমায়ের কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজে চোখে দেখেছে !

—জিজ্ঞেস আর কি করব ! আজই ব্যবস্থা করছি আমি। কর্ত্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে ; সিদ্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজীকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

* * * *

অপরাহ্লেরও শেষভাগ।

বাজীকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজীকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক। আমি এলাম বল্যে।

দলের কেহ কোন প্রশ্ন করিল না, বলিল—আচ্ছা।

হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজীর ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি ?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড বাডাবাড়ি করছিস কিন্তুক। মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও' কথা বলিয়াও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁখালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটীর রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্য্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা গো। গান! নাচন দেখ। নাচন! মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ী আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ! মুখখানা তাহার ভাল লাগিল। গান শেষ করিয়া সে শশীকে ডাকিল—শোন।

—কি ?

—উপরে মানুষটি কে ?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভাল বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাস হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার দুয়ারে সারাদিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁজের পরে ঘর ঘেরাও করবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, জানি।

এক কাজ কর। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা ক'রে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা, তুমরা চেঁচাও সাপ সাপ বল্যা। আমি উয়াকে নিয়ে চল্যা যাই, পুলিশের নোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজীকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

বাজীকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজীকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কী আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ববাড়ীর তত্ত্বতল্লাসের জিনিষপত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়ীতে। পাল্কী হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর বধূ—মুখুজ্জে বাড়ীর মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কী সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূকে আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে কর্ত্তার অমত কোনও কালেই ছিল না। মুখুজ্জে গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার

প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপরে, তিনি জামাইয়ের মা, তাহার উপর তিনি গাহিতে পারেন? মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্ত্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে-জামাইয়ের পূজার ফর্দ্দ লইয়া।

মুখুজ্জে গিন্নী কর্ত্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাহাব প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ী পরিয়াছে, ব্লাউস পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কি পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত—সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কি সর্ব্বনাশ বল দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন—যাও, আপনার ঘর দেখে-শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন—তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্ত্তার ঘরের দিকে গেলেন। কর্ত্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতে-ছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

হুঁ।

আফিং যদি না খেতে চাইবে তবে বৌমা কাঁদল কেন? বাজকরুণী ভাগ্যে দেখেছিল! ছু ড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্ত্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওদেব খবর মিথ্যা হয না গিন্নী! ওরা কারা জান! আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওবা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলা দেশেই বা ক'জনে জানে! শোন;—

রাঢের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরেব এক অতি নিপুণ সম্প্রদায সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অর্ধভৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—

গিন্নী চলিযা যাইতেছিলেন, কর্ত্তা বলিলেন শেষটা শোন—

গিন্নী পিচ্ কাটিযা বলিলেন, ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা!

* * * *

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজীকরকে বিদায় দিয়া বাজীকরী বলিল—চললাম লাগর! এইবার চল্যা যাও সোজা!

দ্রুতপদে বাজীকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বারবার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহুকষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল—সে ডাকিল শোন!

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে-অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না বাজীকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

শ্রীনাথ ডাক্তার

ক্লাবে 'প্রফুল্ল' অভিনয় হইবে তাহারই মহলা চলিতেছিল। আমার যাইতে একটু দেরী হইয়াছিল। একটু লজ্জিত ভাবে আসরে বসিলাম। ওপাশ হইতে প্রেসিডেণ্ট পবিত্রবাবু ডাকিয়া বলিলেন, ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিলেন।

তাঁহার অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন। লম্বাচওড়া, সুস্থ, সবল দেহ। প্রৌঢ়ত্ব বোঝা যায় শুধু চুলের শুভ্রতায় আর দন্তহীনতায়। মাথার চারিপাশের চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু সামনের চুলগুলি বেশ কালো, সযত্নবিন্যস্ত। সম্মুখের গুটি দুই তিন দাঁত নাই, তাহার পরেই দুটি দাঁত বেশ বড় বড়, ঠোঁটের উপর চাপিয়া আছে। কাঁচাপাকা বেশ বড় গোঁফ এক জোড়া, দুই প্রান্ত তাহার পাকাইয়া উঠিয়াছে। দুইটি আয়ত প্রদীপ্ত চোখ। দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয় লোকটি সাহসী, হয়ত বা কিছু উগ্র।

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনার বইখানা পড়ছিলাম। প্রতি-নমস্কার করিয়া আমি একটু হাসিলাম। পবিত্রবাবু তাঁহার পরিচয় আমাকে দিলেন, উনি শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

এখানে প্রাক্‌টিস করবেন বলে এসেছেন। আমার ওখানেই এখন রয়েছেন।

বলিলাম, বেশ বেশ। ভাল হল আমাদের। এখানে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের অভাব খুব।

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, আমারও অভাব খুব সামান্যই স্যার। পেটের ভাত আর পরবার কাপড়, অন্ন এবং বস্ত্র। মাসে কুড়ি পঁচিশটে টাকা।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিবাস ?

শ্রীনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, জন্মস্থান নদে জেলা। কিন্তু বাস করবার কোথাও অবকাশ পাইনি। ঘুরতে ঘুরতেই জীবন কাটছে। দেখি শেষ কটা দিন যদি আপনাদের এখানেই কেটে যায়। সেই খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, পথে কাল পবিত্রবাবুর সঙ্গে আলাপ। চলে এলাম ওঁর সঙ্গে।

—কান মলে দেব এয়ার ছোকরা। চাঁচা গলায় 'জগমণি'র চীৎকারে চমকাইয়া উঠিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, ও বাবা !

আমি হাসিয়া বলিলাম, ও পার্টটা ও করে ভাল। ডাক্তারের দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না, 'জগমণি'র ভাবভঙ্গী দেখিয়া পূর্ণভাবে মুখ খুলিয়া হাসিতেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি মেয়েছেলে আনবেন ত ?

ডাক্তার জলের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে উত্তর দিলেন, ভাগ্যবান পুরুষ

স্থর স্ত্রী মরে গেছে। ঘোড়া কখনও ছিল না, কাজেই তুর্ভাগ্য কাছ ঘেঁসতেই পারলে না।

—ছেলেমেয়ে ?

—ওয়ান মাইনাস ওয়ান। একটা হয়েছিল, তিন দিনের দিন আঁতুড়েই গেছে। জীবনে এক বোতল হরলিকস্ কিনেছি মোটে।—হা-হা করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

'জগমণি' চীৎকার করিয়া উঠিল, চোপ ইষ্টুপিট !

ডাক্তারের হাসিতে টিনের চাল যেন ফাটিয়া পড়িল।

—বড় গোল হচ্ছে মশাই।

গলা মোটা করিয়া কে উইংসের ফাঁক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। বক্তাকে দেখা গেল না—অন্ধকারে শুধু জলন্ত বিড়ি একটা জোনাকীর মত টিপ-টিপ করিতেছিল। ডাক্তার হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আপনাকে যা বলছিলাম। আপনার বইখানার কথা—শোকে এমন অভিভূত হওয়া মানে তার একটি স্থায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়া, আমার মতে এ অবাস্তব। তুদিন না হয় চারদিন, তারপর আবার কি ? মন হাঁপায় হাসবার জন্যে, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বিমর্ষ হয়ে থাকতে হয় দায়ে পড়ে ; আমি ত অনুভবই করলাম না মশায়।

আমার চোখে দেখা ছবি, কিন্তু সে লইয়া তর্ক করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। নবপরিচিত বলিয়াও বটে আর লেখক বলিয়া যে মর্য্যাদাবোধ বা অহঙ্কার তাহাতেও বাধিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ডাক্তার কিন্তু অদ্ভুত লোক, ছাড়িবার পাত্র নয়। আমাকে তুর্ব্বল ভাবিয়া জোর করিয়া ধরিলেন, আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে আপনাকে।

ঠিক এই সময় একটা গোলমাল উঠিয়া আমাকে ত্রাণ করিল। যে লোকটি পাহারাওয়ালা সাজে সে বাঁকিয়া বসিয়াছে।

—ও পার্ট আমি করব না মশায়। চর না হয় দূত, গতবার আবার দিলেন অনু-চর। এবার আবার পাহারাওয়ালা—এ মশায় আমি করব না।

লোকটাকে পাহারাওয়ালার পার্ট দেওয়া চলেও না। সরল সূতা তাড়াতাড়িতে যেমন জট পাকাইয়া বসে—তেমনি কথা কহিবার দ্রুততা হেতু লোকটার কথার মালায় জট পাকাইয়া যায়। এ যুক্তি সে বুঝিবে না। বলে—ক্যানে মশাই এগুন কতা কি থাকে নান্ না কি?

কে বলিল, বেশ তুমি যোগেশের পার্ট কর।

ওদিক হইতে কে ভ্যাঙাইয়া উঠিল, এগুন কতা কি থাকে না নান্ না কি?

লোকটা আর কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। আরও দুই একবার এমনি করিয়া সে চলিয়া গেছে। আমাদের জানা ছিল যে, ও এবার আর ফিরিবে না। আগামী বারে অবশ্য ডাকিতে হইবে না। মহলা বসিবার দিন হইতেই নিয়মিত আসিবে। কিন্তু এবার ও হিমালয়। পাহারাওয়ালা খুঁজিয়া আর পাওয়া যায় না। কে বলিল, বাবুদের চাপরাশী ধরে নামিয়ে দেব।

কিন্তু—কথা আছে যে। সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তুমি—তুমি—তুমি?

সকলেরই পার্ট আছে। যাহার নাই—সে বলিল, আমিত থাকবই না সে দিন, নইলে—।

যাত্নকরী

—আমাকে দিয়ে চলবে মশাই ?

লম্বা-চওড়া ডাক্তারবাবু উঠিযা,দর্জ্জির দোকানে মাপ দিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। খাড়া সোজা মানুষ, চুল ও দাঁত ছাড়া অবযবেব কোনখানে প্রৌঢত্বের অবসন্নতা একবিন্দু নাই। দেখিযা আনন্দ হইল।

কে বলিযা উঠিল, দি ম্যান ফব দি পার্ট। ভগবান যেন পাহাবা-ওযালা সাজতেই ওঁকে গড়েছিলেন।

অল্পবযস্কেব দল হাসিযা উঠিল। আমবা কযেকজন খুব লজ্জিত হইযা পডিলাম। একটা ধমক দিযা পবিত্রবাবু কি বলিতে গেলেন—কিন্তু ডাক্তাব তাহার পূর্ব্বেই নিখুঁত একটি মিলিটারী অভিবাদন করিযা বলিয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যর, বলুন বলুন, কি বলতে হবে বলুন। আমি কিন্তু মশাই থিয়েটার কখনও করিনি।

প্রম্পটার ওদিক হইতে বলিল, সেলাম হুজুর।

ডাক্তার আবার মিলিটারী কাযদায় সেলাম করিয়া বলিলেন, সেলাম হুজুব।

কে বলিল, উঁহু, হল না। সেলাম কি এমনি না কি ?

গম্ভীর ভাবে ডাক্তার বলিলেন, পুলিশ সেমি-মিলিটারী।

বক্তা রামসুন্দর পান-বিড়ির দোকান লইয়া মেলায় মেলায ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার দোকানে কনেস্টবলেরা প্রায়ই পান খায়। তাহা ছাড়া, ঐতিহাসিক নাটকে প্রায়ই সে প্রহরী সাজে। সে এ কথা মানিল না। বলিল, তা মিলিটারী সেলাম কি ওই রকম নাকি ?

ডাক্তার বলিলেন, 'আর্মি'তে তিন বছর ছিলাম মশাই। মিলিটারী স্যালিউট কি, তা শিখতে তিন বছর সময় কি যথেষ্ট নয় ?

বুঝিলাম ডাক্তার চটিয়াছেন। কাহাকেও আর কষ্ট করিয়া রামসুন্দরকে নিরস্ত করিতে হইল না। 'আর্মি'র উল্লেখেই সে ঘায়েল হইয়া পড়িয়াছিল। নিজেই সে চুপ করিল, বলিল, কে জানে মশাই। যা ভাল হয় করুন।

মানুষটিকে লইয়া আমার কৌতূহলের সীমা রহিল না।

*　　　　*

সময়টা শীতের প্রারম্ভ। মাঠে ধান কাটা হইতেছে। পরদিন গিয়াছিলাম ধান কাটার তদারকে। ফিরিতে প্রায় এগারটা হইয়া গেল।

—সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু!

অপরিচিত উচ্চকণ্ঠে কে ডাকিতেছিল। ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম মাঠ ভাঙিয়া দ্রুতপদে আসিতেছেন কল্যকার সেই ডাক্তার। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, এমন সময় আপনি?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তিনটের সময় ওঠা আমার অভ্যেস। উঠে দেখি, পবিত্র বাবুর বাড়ী স্বপ্নবিভোর। কি করব, বেরিয়ে পড়লাম। আপনাদের দেশটা দেখে এই ফিরছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগল?

—মাটী দেখলাম। দেশ দেখতে পেলাম না। তবে কল্পনা করছি এ মাটীর মানুষ ভালই হবে। এই দেশেই বাস করব।

আমি হাসিলাম। ডাক্তার বলিলেন, চলুন আপনার বাড়ী যাই।

কথাটা আমারই বলা উচিত ছিল। লজ্জিত হইয়া বলিলাম চলুন—চলুন।

চলিতে চলিতে ডাক্তার বলিলেন, কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি।

উত্তর দিলাম, নতুন জায়গায় ঘুম সচরাচর হয় না।

—কেন হয় না বলুন ত? সমস্ত রাত্রি অতীত জীবনটা ইতিহাসের পড়ার মত মুখস্থ করেছি।

চট করিয়া উত্তর দিলাম না। কথাটা ভাবিতেছিলাম।

ডাক্তার আবার বলিলেন, কেন এমন হয় বলুন ত?

বলিলাম অপরিচয়ের মধ্যে একটা পীড়া আছে, ডাক্তার বাবু। পারিপার্শ্বিকের মমতাহীনতা আমাদের পীড়া দেয়। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় আমি একা, এরা আমার পর। দোষও নেই, অপরিচিত স্থানে পাই আমরা ভদ্রতা—একান্ত মৌখিক বস্তু। ঠিক তুলোর মত, পরিমাণে হয়ত অনেক কিন্তু ওজন কই তাতে?

কথাটা ডাক্তারের মনে ধরিল, বলিলেন, ঠিক বলেছেন, নতুন জুতো পায়ে দেওয়া আর কি! ভেতরের চামড়ার রং-কষ যতক্ষণ না উঠছে—ততক্ষণ পা দিলেই লাগবে রং, স্নায়ুশিরা হবে আড়ষ্ট—হোক ছেঁড়া, তবু পুরোনো জোড়ার হাজার গুণ মনে পড়বে।

হাসিয়া ফেলিলাম। ডাক্তার বলিলেন, উপমায় আমার ভুল পাবেন না। বিচার করে দেখুন। জুতো না থাকাটাই হল স্বাভাবিক অবস্থা পায়ের। অথচ জুতো না হলে তার চলবে না। ফোস্কা হবে, টন টন করবে, তবু চাই। মানুষের দেখুন—একা আসে—একা যায়—একাকিত্বই তার সত্য অকৃত্রিম অবস্থা; তবু সে একা—তার কেউ নাই, মনে হলেই বুকে যেন পাথর চেপে বসে।

বলিলাম তা সত্য।

উৎসাহ পাইয়া ডাক্তার আরম্ভ করিলেন, আবার দেখুন, নতুন জোড়াটি যাই মুখস্থ হল বাস, পুরোনো জোড়াটা মাটীতে পুঁতে তার ওপর নারিকেল গাছ রোপণ করা হল। তাইত বলছিলাম কাল, আসলে মানুষ হল একা। তার শোক দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। স্ত্রী মারা গেলেন মশাই, তাঁর বাপের বাড়ীতে মারা গেলেন, মা-বোনের কান্নাকাটীতে ঘরের ছাদ ফেটে গেল। সিঁদুর—আলতা—ফুলের মালা দিয়ে তাঁরা শব সাজাতে আরম্ভ করলেন। দাঁত ভেঙ্গে গেছে—জিভের আগল নেই, বলে ফেললাম, খালি মদের বোতলে আর সিঁদুর দেওয়া কেন? বাস্, সিদ্ধান্ত হয়ে গেল—মাতাল আমি—আমিই বোতল খালি করেছি। তারপরই—নিকালো হিঁয়াসে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। চলে এলাম কলকাতায়। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল—গড়ের মাঠের ভিড়—কোথায় যে তার মধ্যে দুঃখ হারিয়ে গেল—সাগরে যেন নদীর ঘোলা জল মিশে গেল। বাস্!

আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। মৃত প্রিয়জনের জন্য বেদনার ক্ষত আরোগ্য হয় মানি, কিন্তু সেখানে দাগ একটা থাকিয়া যায়। সেখানে হাত পড়িলে বেদনায় টন্ টন্ না করুক—অন্ততঃ ক্ষতবেদনার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। অনুমান করিলাম, স্ত্রী ডাক্তারের প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল—কিন্তু প্রিয়া ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, কি রকম? আপনি যে চুপ করে গেলেন স্যর! জিভের গোড়ায় আসিয়া পড়িল—ভাবছি এমন সহজভাবে এসব কথা আপনি বলেন কেমন করে?

কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলাম।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে মুখুজ্জ্যেদের বাড়ী। কর্ত্তা মুখুজ্জ্যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রবণ অমায়িক ব্যক্তি। বাহিরে বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নমস্কার!

মুখুজ্জ্যে মহাশয় সবিস্ময়ে প্রতি-নমস্কার করিয়া কুণ্ঠিতভাবেই আমাকে প্রশ্ন করিলেন, সুরেশ, ইনি?

পরিচয় আমাকে দিতে হইল না। ডাক্তার নিজেই সপ্রতিভভাবে বলিলেন, আপনাদের আশ্রয়ে থাকব বলেই এসেছি। নাম আমার শ্রীনাথ দেবশর্ম্মা, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আমি। আপনি চলুন সুরেশবাবু, আমি গেলাম বলে।

ডাক্তার বোধ হয় আমার অসহিষ্ণু ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমি নিজেও ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ডাক্তারের অনুরোধ উপেক্ষা করিলাম না।

বৈঠকখানায় হাতমুখ ধুইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে ডাক্তার আসিয়া হাজির হইলেন। চুপ করিয়া থাকা যেন ডাক্তারের অভ্যাস নয়, তিনি বলিলেন, মুখুজ্জ্যে মহাশয়ের সঙ্গে আবার একটা সম্বন্ধ বেরিয়ে গেল মশায়। দূর সম্পর্ক অবশ্য।

বলিলাম, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তারপর উনিই বললেন, আপনার মামার বাড়ী নাকি পাটনায়? আপনার মাতামহের নাম কি বলুন ত?

পরিচয় দিতেই ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন। প্রকাণ্ড একটা বংশ-পরিচয় আওড়াইয়া সম্বন্ধ তিনি একটা বাহির করিয়া ফেলিলেন,

আমার মাতামহ তাঁহার দূরসম্পর্কীয় মামা। ভদ্রতা রক্ষার জন্য প্রণাম করিতে উঠিলাম। ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, ও নয়, সুরেশ বাবু। বন্ধু আত্মীয় হলেন এই আমার পরম লাভ। মরি যদি তবে সৎকার হবে এই ভরসাই যথেষ্ট। ঐ টুকুই আমার আত্মীয়তার দাবী রইল। প্রণামের চেয়ে বরং চা আনতে বলুন।

তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম।

চা লইয়া ফিরিয়া দেখি ডাক্তার খবরের কাগজ পড়িতেছেন। চা-টা আগাইয়া দিলাম। ডাক্তার সহাস্যমুখে কাগজখানা একটু সরাইয়া দিয়া বলিলেন, পুলিশের বড়কর্ত্তার কাছে একখানা দরখাস্ত করব। পুলিশ এখন সত্যিই নারীহরণের প্রতিকারে মন দিয়েছে।

তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার বলিলেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার স্ত্রীকে 'বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

বিস্ময়ের আমার সীমা ছিল না; প্রশ্ন করিলাম, সে কি? তবে যে—

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। হরণকর্ত্তা দুর্ব্বৃত্ত যম।

তারপর হো-হো করিয়া হাসিয়া ঘরখানা যেন ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

এতটা আমার ভাল লাগিল না। হয়ত ঠিক বলা হইল না, মনটা আমার বিষাইয়া উঠিল। বলিয়া ফেলিলাম, মাপ করবেন ডাক্তার বাবু, আপনার স্ত্রীর জন্যে আপনার মনে কষ্ট হয় না?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন, হাত পুড়িয়ে রান্না করবার কষ্ট যেটুকু—দুঃখই বলুন আর শোকই বলুন সেও ঠিক ওইটুকু। ওজন করলে এক তিল বেশী হবে না।

সবিস্ময়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, এখন রান্নার কষ্ট সহ্য হয়ে গেছে, শোক বাক্যটার বানান পর্য্যন্ত মনে নেই। দৈবাং কোন দিন হাত-টাত পুড়ে গেলে নেশার খোঁয়াড়ীর মত মাথার মধ্যে একটু বোঁ-বোঁ করে দেখা দেয়। সে একটু ওষুধ লাগিয়ে এক গ্লাস জল খেলেই ঠাণ্ডা!

আবার ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত ততখানি জোরে নয়। বোধ হয় আমার বিরক্তি তিনি বুঝিয়াছিলেন। আমি নীরব হইয়া ভাবিতেছিলাম, মানুষের বৈচিত্র্যের কথা। আকারে, অন্তরে প্রত্যেক জন স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। এই শোকেই ত কতজন পাগল হইয়া যায়। আমার নিজের কথাতেই জানি, দেড় বৎসর পূর্ব্বে আমার পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে মারা গেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এমন একটি দিন যায় না, যেদিন সে সকরুণ মুখে, আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া না দাঁড়ায়! আজকে ঠিক এই মুহূর্ত্তেই সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বুকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল, চোখে জল আসিয়াছিল, কোনরূপে গোপন করিলাম। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস বাধা মানিল না।

ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন। আমার মনে হইল, সে হাসি যেন ছুরির মত তীক্ষ্ণ। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আমার হারানো মেয়েটি যেন শিহরিয়া উঠিল। ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন। আমি প্রচ্ছন্ন ঘৃণাভরেই বলিলাম, বেলা অনেক হল, আপনি আসুন ডাক্তার বাবু।

*　　　*　　　*

দিন তিনেক বাড়ীতে ছিলাম না। কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিলাম তৃতীয় দিন রাত্রে। সকাল বেলা একটি কলরবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখি, পাড়ার ছেলেরা হাট বসাইয়া ফেলিয়াছে। তার মধ্যে দেখি আমার তিন বৎসরের মেয়েটি পর্য্যন্ত দুই হাত তুলিয়া নাচিতেছে। নিশ্চিত হইয়া ভাবিতেছিলাম —এই তিন দিনের মধ্যে আমার বাড়ীটাকে এমন শিশু-মঙ্গল মঠ বানাইয়া তুলিল কে? আমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিল আমার মেজ ভাই। আমার বিস্মিত মনোভাব বোধ করি সে বুঝিয়াছিল, বলিল, শ্রীনাথ বাবুর মক্কেল সব।···ঐ যে ডাক্তার বাবু আসছেন।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারের নাতিউচ্চ প্রাচীরটার ওপাশে ডাক্তারের মাথা দেখা যাইতেছে।

—নমস্কার! কখন এলেন? কাল রাত্রে বোধ হয়! ওদিক হইতেই ডাক্তার সম্ভাষণ করিলেন।

প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, পসার যে জমিয়ে তুলেছেন দেখছি।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন, কান টানলে মাথা আসে জানেন ত। ছেলের হাত ধরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকব।

ছেলের দল এমন কলরব করিয়া উঠিল যে, আমার আর উত্তর দেওয়া হইল না। বাগানের মধ্যে বাঁধান বেঞ্চটার উপরে বসিয়া ডাক্তার বলিলেন, ভোর বেলাতে কার জয়? সমস্বরে ছেলেগুলা চেঁচাইয়া উঠিল, স্থয্যি মামার জয়।

—তাঁকে সবাই প্রণাম কর।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল কচি কচি হাতগুলি তুলিয়া নমস্কার করিল।

তারপর ডাক্তার বলিলেন, লাইন করে দাঁড়াও সব।

এইবার ঔষধ পরিবেশন আরম্ভ হইল। এক পুরিয়া করিয়া শুগার অব্ মিল্ক। তৃতীয় ছেলেটিকে ঔষধ দেওয়া হইল না। তাহাকে লাইন হইতে বাহির করিয়া অন্য স্থানে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, তুই পরে ওষুধ পাবি। তোর নাক দিয়ে সিক্‌নি ঝরছে।······এই—এই—জিভ দিয়ে চেটে খাসনে। ঝেড়ে ফেল।

আবার আর একজনকে ধরিয়া বলিলেন, এই ন্যাদা, তোর পেটের অসুখ কেমন আছে ?

—কাল রাত্রে একবার পেট কামড়েছিল শুধু। ভাল হয়ে গিয়েছে, মা বলছিল।

—তুইও বাইরে দাঁড়া।

এ লাইন শেষ হইলে ডাক্তার কয়টা শিশি বাহির করিয়া বসিলেন, পৃথকভাবে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা এইবার ঔষধ পাইবে।

এদিকে চা আসিয়া পড়িয়াছিল, ডাক্তারকে বলিলাম, চা এসেছে, আপনার শিশু-মঙ্গল শেষ করুন।

ডাক্তার বলিতেছিলেন সরকারদের সুধীরকে, দাঁড়া তুই একটু। তোর বাবাকে দেখতে যাব।

সরকার-পরিবার আমাদের প্রতিবেশী। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে সুধীরের বাপের ?

ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, আরে মশায়, আপনারা প্রতিবেশীর খবর রাখেন না ! লোকটা আজ দশদিন শয্যাশায়ী, এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি। নানান গোলমাল, জ্বর, কোমরে একটা এ্যাবসেস উঠছে।

সুধীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাটের পয়সা নাই আজ ডাক্তার বাবু।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক মারিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, চল চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার! আবার দত্তপাড়ার আড্ডায় যেতে হবে।

দত্তপাড়ার আড্ডা গ্রামের একটি বিখ্যাত আড্ডা। কড়ি, কলম প্রভৃতি নানা চিহ্নযুক্ত গোটা বিশেক হুঁকা অগ্নিগর্ভ বয়লারের মত অবিরাম সেখানে ধূমোদ্গীরণ করে। বয়সের তারতম্যের কোন বালাই নাই। ভাগবত, পুরাণ, রাজনীতি, আইন আদালত, পরনিন্দা, এমন কি পরস্ত্রী-চর্চ্চা পর্য্যন্ত অবাধে অনুশীলিত হইয়া থাকে।

তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেখানে?

হা-হা করিয়া হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, ও আড্ডারও সভ্য হয়েছি মশাই।

তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, বন্ধু হিসেবে হয় ত ওরা ভাল নয় স্থরেশ বাবু, কিন্তু সঙ্গী হিসেবে ওরা বড় ভাল। সময়ের ওদের কোন মূল্য নেই।

কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, ডাক্তার উদারচরিত ব্যক্তি। সমস্ত দিনের মধ্যে ভদ্রলোকের অবসর নাই। বসুধার এই ক্ষুদ্রতম অংশটির প্রত্যেকের সহিত কুটুম্বিতা করিতে করিতে সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। কোন কোন দিন দশ এগারটাতেও সঙ্কুলান হয় না! পাশায় কিম্বা দাবায়, বা বিনা পয়সার কোন রোগীর শিয়রে পুনরায় প্রভাত হইয়া যায়। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সবাই ডাক্তারের বন্ধু।

হাসি আর রহস্য ছাড়া শ্রীনাথ ডাক্তারের কথা নাই! চেষ্টাকৃত রহস্য বা রহস্যের মাত্রাহীনতার জন্য, অনেকে অনেক সময় বিরক্ত হয়, কিন্তু ডাক্তারের অট্টহাসির অভাব হয় না। রহস্য করিবার লোক না পাইলে ডাক্তার রোগী খুঁজিয়া বেড়ান।

কোন অবলম্বন না থাকিলে আমার মাথা খাইতে আসেন। ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ আসিয়া চাপিয়া বসিয়া বলেন, কি, লিখলেন আজ? কই পড়ুন শুনি।

লোকের বিরক্তি ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, সে কথা আমার কানেও আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে আমিও বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেদিন ইঙ্গিতে সে ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম, একটা ডাক্তারখানা করে বসতে আরম্ভ করুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, একটা ঘর দেখে দিন না।

খানিক পরে ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একা যে থাকতে পারিনে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

*　　　　*　　　　*

অকস্মাৎ ডাক্তারের জীবনে একটা পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দিন পাঁচেক ডাক্তারের দেখা না পাইয়া সেদিন ডাক্তারের বাসায় গিয়া উঠিলাম।

ডাকিলাম, ডাক্তার বাবু!

ভিতর হইতে উত্তর আসিল, আসুন।

আমি কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ডাক্তারের মুখস্ত-করা রসিকতা একটি। ইহার পূর্ব্বে ডাক্তার বলিতেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, মেয়েদের সরে যেতে বলি।

প্রথম দিন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ডাক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলাম।

আজ ভিতরে গিয়া দেখি ডাক্তার একরাশ বই লইয়া বসিয়া আছেন। একখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড একখানা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বই। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? রসশাস্ত্র ছেড়ে হঠাৎ রসায়ণ নিয়ে পড়লেন যে?

ডাক্তার মুখ তুলিলেন। গম্ভীর চিন্তায় সমস্ত মুখখানা থম থম করিতেছে। চশমার ভিতরে বড় বড় দীপ্ত চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত স্থির, পলকহীন। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, ভেরি ইণ্টারেষ্টিং কেস মশায়।

তারপর বাঁ হাতের আঙুল দিয়া সামনের একগোছা চুল লইয়া অনর্থক পাক দিতে দিতে আবার বলিলেন, এ্যালোপ্যাথরা কেউ বলে প্যারালিসিস, কেউ বলে নার্ভাস ডিরেঞ্জমেণ্ট কেউ বলে ফাইলেরিয়া। কিন্তু আমার—

ডাক্তার আবার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার কি মনে হয়?

দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার বলিলেন,—দেখি—এখন স্থির সিদ্ধান্ত কিছু করতে পারিনি।

ডাক্তারকে বিরক্ত করিলাম না উঠিয়া পড়িলাম। ডাক্তার একখানা

বই বন্ধ করিয়া বলিলেন, উঠছেন? দুটো ভাত আজ পাঠিয়ে দিতে পারেন? রান্নার হাঙ্গামা আজ আর করব না। কাল রাত্রেও খাইনি।

বলিলাম, সে কি?

আর একখানা বই খুলিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার বলিলেন, ভেরী ইণ্টারেষ্টিং কেস মশাই।

* * *

এই একটি রোগীর চিকিৎসা করিয়াই ডাক্তার এ অঞ্চলে খ্যাতি লাভ করিলেন। রোগীটি অবশ্য বাঁচে নাই। কিন্তু সে কলঙ্কও ডাক্তারকে স্পর্শ করিল না। শেষের দিকে রোগীর দেহের কয়েকটি স্থান পাকিয়া উঠিতেই এ্যালোপ্যাথরা ছুরি চালাইবার জন্য রোগীটিকে ছিনাইয়া লইয়াছিল। রোগীর আত্মীয়-স্বজন ডাক্তারকে মত জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তার বলিয়াছিলেন, বাঁচবে কি না আমি বলতে পারিনে—বরং একটু সন্দেহ হয়। কিন্তু কাটাকাটি করলে ফল ভাল হবে না এটা নিশ্চয়। হইয়াছিলও তাই।

ফলে ডাক্তার প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, ডাক্তার কল-বাক্স সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। শুধু তাই নয়, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের বাসায় প্রকাণ্ড একটি আসরও জমিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য কথা এই যে, পূর্ব্বে ডাক্তারের যাওয়ায় যাহারা বিরক্ত হইত তাহারাও এ অবস্থায় আসিতে দ্বিধা করে না। আড্ডা চলে, ডাক্তার কিন্তু অধিকাংশ সময় ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকেন। ডাকিতে গেলে দেখা যায়, ডাক্তার একরাশ বই সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছেন, মুখ উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, টি-বি, মানে, যক্ষ্মা কত রকম জানেন?

একটু থতমত খাইতে হয়। ডাক্তার ইত্যবসরে আবার আরম্ভ করেন, ভয়ঙ্কর ব্যাধি, মৃত্যুর নিঃশ্বাস থেকে বোধ হয় এর উৎপত্তি। সেদিন একটা মাদার-টিঞ্চারের শিশি দেখাইয়া বলিলেন, এ ওষুধটা কিসের থেকে তৈরী জানেন? কলার কন্দ থেকে। বিষ থেকে পর্য্যন্ত ওষুধ তৈরী হয়। বিষের মধ্যেও অমৃত আছে। অদ্ভুত সৃষ্টি ভগবানের।

অকস্মাৎ ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, সমুদ্র-মন্থন কাহিনীটা আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমি কিন্তু করি। সমুদ্রের তলদেশে এমন সব উদ্ভিদ, জীবজন্তু আছে যা থেকে অমৃত প্রস্তুত হয়।

*   *   *   *

দুই তিন দিন পর। বৈকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টির পর সূর্য্য কিরণে আকাশ একখানা অখণ্ড অসীমবিস্তার গাঢ় নীল স্ফটিকের মত ঝলমল করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম, হঠাৎ?

প্রশ্ন সমাপ্তির পূর্ব্বেই ডাক্তার বলিলেন, একটু বেড়াতে যাব, যাবেন?

এমন প্রসন্ন অপরাহ্ণ উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি আমারও ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার চিন্তাকুল ভাবেই পথ চলিয়াছিলেন। আমরা দুইজনে নদীর ধারে আসিয়া বসিলাম।

ডাক্তার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনার সেই বইখানার কথা আজ সমস্ত দিন ভেবেছি সুরেশ বাবু।

কৌতূহল হইল। প্রশ্ন করিলাম, কেন বলুন ত?

ডাক্তার গভীর চিন্তার মধ্যে হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, প্রথম দিনই এ প্রশ্ন আপনাকে করেছিলাম, মনে আছে আপনার ?

আমার মনে পড়িল, কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না।

ডাক্তারই আবার বলিলেন, শোকের স্থায়িত্ব দীর্ঘদিন—এমন কি, চিরজীবনই ধরুন। আমি শুধু ভাবছি আপনি যা দেখিয়েছেন—এটা বাস্তব কি না ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কি অবাস্তব মনে হয় ?

ধীরে ধীরে ডাক্তার উত্তর দিলেন, হত, যদি আপনার নায়ক মদ না খেত। মদ খেয়ে সে যদি ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে না ফেলত, তবে অবাস্তব হত। ভবিষ্যতের আশা-আলো যতক্ষণ জ্বলবে—ততক্ষণ শোক স্পর্শ করে জলের মত। একটু পরেই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ বিষ বলুন বিষ—অমৃত বলুন অমৃত। কোটী কোটী নমস্কার এর আবিষ্কারককে।

ডাক্তার পকেট হইতে ছোট একটি ফ্লাস্ক বাহির করিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম, প্রশ্ন করিলাম ও কি ?

ডাক্তার বলিলেন, মদ। আপনি মদ খান ?

বিরক্তিভরে বলিলাম, না।

ধীর ভাবে ডাক্তার বলিলেন, আমি খাই, বহুকাল থেকে খাই। স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন, সে প্রায় চব্বিশ বছর, নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে খেয়ে এসেছি। তিনি নিজে ঢেলে দিতেন আমি খেতাম। স্ত্রী মারা গেলেন, তারপর উন্মত্তের মত অপরিমিত পান করেছি। কিন্তু এর

চেয়েও প্রবল নেশা আছে সুরেশ বাবু—পৃথিবী দূরের কথা—মদের তৃষ্ণাও ভুলিয়ে দেয়।

কিছুদিন হইতেই ডাক্তারের চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সন্দেহ হইতেছিল হয়ত বা ডাক্তার বেশ প্রকৃতিস্থ নন। আজ সে সন্দেহ ঘনীভূত হইল। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম, দেখছেন ডাক্তার বাবু, সূর্য্যাস্তের রং-এর বাহার!

ডাক্তার একবার আকাশের দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন। ওপারে নদীর ঘাটে জল লইয়া কয়টি মেয়ে গ্রামে ফিরিয়া চলিয়াছিল।

ডাক্তার বলিলেন, মেসোপটেমিয়ার কথা মনে পড়ছে। সেখানে অবসর পেলে এমনি বসে সম্মুখের পানে চেয়ে দেশের কথা ভাবতাম। টেণ্টের সুমুখে যেদিন বসতাম সেদিন টেবিলের উপরে থাকত হুইস্কি আর বিয়ারের বোতল। সেইখানেই মদের এই গুণের পরিচয় পাই। অতীতকে উজ্জ্বল করে তোলে—বিস্মৃতির বদ্ধ দ্বার ভেঙে বেদনাকে বুকের মধ্যে মুক্তি দেয়।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, চলুন ডাক্তার বাবু ওঠা যাক।

উঠিতে উঠিতে ডাক্তার বলিলেন, আজ আমার ফুলশয্যার দিন। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যেও আমার স্ত্রীর মুখ আমি একবারও মনে করতে পারলুম না সুরেশ বাবু। নিবিষ্ট মনে যতবার চিন্তা করতে গেলাম, মনে জেগে উঠল ক্ষয় রোগ আর তার ওষুধ। ডাক্তার নীরব হইলেন। মৌন মৃদু অন্ধকারের মধ্যে দুজনে নির্জ্জন পথে চলিয়াছিলাম। লাল কাঁকর বিছানো পাকা রাস্তাটার উপরে দুজনের জুতার শব্দ একসঙ্গে

সৈনিকের পদশব্দের মত বাজিতেছিল। এটি ডাক্তারের গুণ। ভদ্রলোক যে কোন সঙ্গীর সঙ্গে কয়েকবার পা মিলাইয়া লইয়া একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে পারেন এবং চলেনও। চলিতে চলিতে ডাক্তারও আরম্ভ করিলেন, অথচ আমার স্ত্রী শুদ্ধমাত্র আমার স্ত্রীই ছিলেন না, আমার প্রিয়তমাও ছিলেন। চিরদিনই আমি দুর্দান্ত প্রকৃতির, প্রথম যৌবনে বাবার শাসন মানি নি। মেডিকেল সিক্সথ ইয়ার পর্য্যন্ত পড়েছিলাম। কিন্তু বাবাকে উপেক্ষা করবার জন্যই পরীক্ষা দিলাম না, হোমিওপ্যাথিক পড়তে আরম্ভ করলাম। সেই আমার মত দুর্দান্ত, তার ওপর তখন আমি মাতাল— আমি স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলাম। তাঁর হাত ছাড়া মদ খাবার অধিকার তিনি আমায় দেন নি, আমি কোন দিন খাই নি।

হঠাৎ একটা জীবের যন্ত্রণাকাতর শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আবার শব্দ উঠিল। বুঝিলাম সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। তাড়াতাড়ি টর্চ্চটা জ্বালিয়া শব্দলক্ষ্যে আলোক-পুচ্ছটা ঘুরাইয়া দেখিলাম। ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান—দেখি, টর্চ্চটা দেখি।

গভীর খাতের মধ্যে আলো ফেলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি দেখিতে দেখিতে ডাক্তার খাতের মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, কোথায় যাচ্ছেন? সাপটা ওইখানেই কোথাও আছে। আহারের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি করলে বড় ভয়ঙ্কর হয় ওরা।

ডাক্তার সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। জঙ্গলটা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার কতকগুলা আগাছা তুলিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কি?

শিশি হাতে টর্চ্চ জ্বালিয়া সেগুলি দেখাইয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন, চেনেন ?

চিনিতে পারিলাম না। ডাক্তার বলিলেন, চেনেন না যখন তখন থাক। এ আমার প্রোফেসনাল সিক্রেট।

ডাক্তার হাসিলেন। ডাক্তারের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলাম— অন্ধকারের মধ্যে ভুল বুঝিলাম কিনা কে জানে, কিন্তু মনে হইল অল্পক্ষণ পূর্ব্বের সে মানুষ এ নয়। সমস্ত রাস্তার মধ্যে ডাক্তার আর একটা কথাও কহিলেন না।

পরদিন বাড়ীতে একটা ছোটখাটো নিমন্ত্রণের ব্যাপার ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী এবং স্বজন-বন্ধুদের নামের ফর্দ্দ করিয়া মেজভাইকে বলিলাম ডাক্তারকে নেমন্তন্ন তুমি করে এস।

কিছুক্ষণ পর সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাক্তার আসতে পারবেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন ?

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, ডাক্তার বেশ প্রকৃতিস্থ নাই। অচেতনের মত পড়ে আছেন। মনে হল সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছেন। ঘরে মদের গন্ধও উঠছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক হইতে আমার অজ্ঞাতসারেই যেন ঝরিয়া পড়িল। শুধু বলিলাম, হুঁ।

মেজভাই বলিল, উঠোনময় কাঁচের শিশি, টেষ্ট-টিউব ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে। পাশের ময়রারা বললে সমস্ত রাত্রি নাকি ভদ্রলোক উঠোনে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর শিশিগুলো ভেঙেছেন।

সে বেলা আর পারিলাম না, অপরাহ্ণে ডাক্তারের বাসায় গিয়া

উঠিলাম। দেখিলাম, পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হইলেও তিনি অপ্রকৃতিস্থ নন্। একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলাম, কি ব্যাপার ডাক্তার বাবু ?

—সমস্ত রাত্রি কাল মদ খেয়েছি আর কতকগুলো যন্ত্রপাতি ছিল—সেগুলো ভেঙেছি।

—যন্ত্রপাতি ! কিসের যন্ত্রপাতি ?

ডাক্তার বলিলেন, মাদার-টিঞ্চার তৈরী করবার। যুদ্ধের পর ফিরবার সময় আমি আমেরিকা ঘুরে আসি। সেখান থেকে মাদার-টিঞ্চার তৈরী করতে শিখে আসি।

ডাক্তার নীরব হইয়া উঠানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কাঁচের টুকরাগুলি রৌদ্রসম্পাতে ঝকমক করিতেছিল। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, ওইখান থেকেই এই অভিশাপ আমি বয়ে নিয়ে আসি।

আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, অভিশাপ বৈকি ! মাদার-টিঞ্চার তৈরী করতে শিখে হঠাৎ খেয়াল হল কি জানেন, আমাদের দেশের ভেষজ থেকে নতুন ওষুধের মাদার-টিঞ্চার তৈরী করব। এ দেশের রোগ, এদেশেই তার প্রতিষেধক ভেষজ আছে। তাই আরম্ভ করলাম। কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে দু তিনটে ছোটখাটো অসুখের ওষুধে কৃতকার্য্য হয়ে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম, সুরেশবাবু। সব তুচ্ছ হয়ে গেল, স্ত্রী পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠলেন, আমার অবহেলায়। আমি তখন পাগল হয়ে উঠেছি যক্ষ্মার ওষুধের জন্যে। আয়ুর্ব্বেদ থেকে ভেষজের নাম সংগ্রহ করি আর মাদার-টিঞ্চার তৈরী করবার চেষ্টা করি। প্রাক্‌টিস প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। স্ত্রী একদিন অনুযোগ করলেন। যেদিন

তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম সুরেশবাবু—সেদিন তাঁর কি আনন্দ! আমার অহঙ্কারে, গৌরবে, তাঁর যেন মাটীতে পা পড়ছিল না। এর পর থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। কোনদিন কোন অভিযোগে তিনি আমায় বিরক্ত করেন নি। তার ওপর সেবা—অক্লান্ত সেবা। একদিন মনে হল, আমার আবিষ্কারে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি। পরীক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, বাড়ীর ওই পোষা বেড়ালটার ওপর পরীক্ষা আরম্ভ করব। আমার স্ত্রীর পোষা বেড়াল—বড় শান্ত—আর তাঁর প্রিয় ছিল।

ডাক্তার নীরব হইলেন। আমিও নীরব। বহুক্ষণ নীরবতার পর আমিই প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

ডাক্তার বলিলেন, তারপর আর কি? বেড়ালটাকে তিনি আদর যত্ন করতেন, তা থেকেই বিষ তাঁতেও সংক্রামিত হল। একেবারে গ্যালপিং থাইসিস। দিন কয়েকের মধ্যেই সব শেষ।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার স্বল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, তখন আমি এতদূর মত্ত যে, রোগের আরম্ভে আমি বুঝতেই পারিনি। তখন তাঁর দিকে লক্ষ্য করবার অবসরও আমার ছিল না। শরীর খারাপ দেখেই তাঁকে আমি জোর করে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। একবার কারণ খুঁজেও দেখলাম না। তারপর ভাবলাম, নিশ্চিন্ত এবার। খাবার জন্যে জ্বালাতনের হাত এড়ান গেল। তারপর যখন টেলিগ্রাম পেয়ে গেলাম তখন আর উপায় ছিল না। আমায় দেখেই প্রথম তিনি কি বলেছিলেন, জানেন? হেসে বলেছিলেন, এখানে সকলে ভয় পেয়ে গেছে, ওগো তুমি কি ওষুধ বের করলে সেই ওষুধ আমায় দাও তো?

জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ওষুধ দিয়েছিলেন ?

—না। তখন বেড়ালটার উপর পরীক্ষায় বিফল হয়েছি, আর আমেরিকার ডাক্তাররা পরীক্ষার ফলে জানিয়েছেন আমার আবিষ্কারের কোন মূল্য নাই—একান্ত অসার।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল, জলকণায় বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মেঘলা আকাশের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ চিত্তে ডাক্তারের কথাই ভাবিতেছিলাম। ডাক্তারও নীরব বসিয়া ছিলেন। কতক্ষণ পর জানি না ডাক্তারই বলিয়া উঠিলেন, শোকও সহ্য হয় না। ভাবি হেসে উড়িয়ে দেব। মানুষের সাহচর্য্য খুঁজি। মানুষ বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার ওপর জীবিকার সমস্যা। বাধ্য হয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু এমনি প্রচণ্ড মোহ এর সুরেশ বাবু, আরম্ভ করলে আর রক্ষা নাই। অকস্মাৎ এই সর্ব্বনাশী নেশা ঘাড়ে চেপে বসে। কাল সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্য করেছিলেন কি সেই ভেষজগুলো পেয়ে আমার পরিবর্ত্তন ? কিন্তু কাল আত্মরক্ষা করেছি—সব ভেঙে ফেলে দিয়েছি।

* * * *

ইহার কিছু দিন পর ডাক্তার অকস্মাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। আমার সহিত কিন্তু আর একদিন ডাক্তারের দেখা হইয়াছিল। কার্য্যোপলক্ষে মাস দুই কলিকাতায় থাকিয়া ফিরিবার পথে গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, ডাক্তার ষ্টেশন-প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। একদল লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে। মদে বিভোর ডাক্তার 'যোগেশে'র পার্ট করিতেছিলেন—মরছ মর মর। আমি কি করব ? আমি মদ খাইনে !

'এই,—এই—একটা পয়সা দাও না—একটা পয়সা দাও না।'

আমি ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম ছি—ডাক্তারবাবু!

মাতালের হাসি হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, পার্টটা কেমন হচ্ছে বলুন ত?
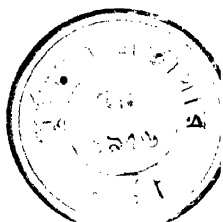
'জায়া'

রূপ স্বতন্ত্র বস্তু—রূপ তাহার কোন কালে ছিল না; কিন্তু অন্নবস্ত্রে দেয় যে শ্রী—সে শ্রী তাহার ছিল। সেটুকুও তাহার থাকিল না। অন্নবস্ত্রের অভাবে নয়, কয় মাসের কারাক্লেশ জলৌকার মত শ্রীটুকু যেন শোষণ করিয়া লইল। জেলে ক্লেশ কিছু সে পায় নাই, কিন্তু তবুও চারমাসের মধ্যেই আমাশয় ও চোখের অসুখে কুব্জ, শ্রীহীন হইয়া ফিরিল। স্থূলতা-বর্জ্জিত শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; খদ্দরের পোষাকও ভারী বোধ হইতেছিল। অবয়বের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরিয়া গেছে—দেহের শ্যামবর্ণ প্রায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে লাবণ্য আর ফিরিল না। শ্রী না ফিরুক দেহ সুস্থ হইল।

জেল হইতে ফিরিয়া তাহার নেশা পড়িল লেখায় এবং গাছ পোঁতায়। নিজেই মাটি কোপাইয়া ফুলের বাগান করে, গ্রামের প্রান্তে প্রকাণ্ড বড় বাগানটায় বট অশ্বত্থের ডাল ও চারা পোঁতে, ফলের গাছও পোঁতে—কিন্তু সংখ্যায় কম। রৌদ্রে বৃষ্টিতে তাহার শ্রীহীনতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই জামা জুতা সে ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পরণে থাকে মোটা কাপড় আর কাঁধে চাদর! চাদর আবার সব সময়ে নয়, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে চাদরটা কাঁধে চাপে। অন্য সময়ে খালি গা, খালি পায়ে সে মূর্ত্তিমান শ্রীহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জেলে থাকিবার সময় ছোট ভাই সংসার

ঘাড়ে লইয়াছিল—সে সংসার তাহার স্কন্ধে দৈত্যের স্কন্ধের আকাশের মতই চাপিয়া রহিল। শিবনাথ সে আর ঘাড়ে করিল না। তবে উপদেশ দেয়—সময়ে সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ক্রটীগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া সংসার রথখানিকে অপেক্ষাকৃত সবল ও দ্রুত গতিশীল করিয়া দেয়।

দ্বিপ্রহরে এক গা ঘামিয়া সেদিন শিবনাথ বাড়ী ফিরিল! খালি গা, খালি পা—কোমরে গুঁজিয়া কাপড়খানা পর্য্যন্ত হাঁটুর উপর টানিয়া তোলা; সাড়া না দিয়াই বাড়ী ঢুকিল।

শিবনাথের স্ত্রী গৌরী ও ছোট বৌ অমলা বারান্দায় থামের আড়ালে বসিয়া পান সাজিতেছিল—গৌরী বলিল, শম্ভু এদিকে শোন দেখি!

শম্ভু শিবনাথের বাড়ীর মাহিন্দার।

শিবনাথ সটান খিড়কীর বাগানের দিকে চলিয়া গেল। গৌরী উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—শম্ভু কোথায় গেল মনুর মা?

রন্ধনশালে ব্যস্ত পাচিকা মনুর মা বলিল—কে জানে বৌদিদি, দেখি নাই ত। কেউ আসে নাই ত'!

ছোট বৌ অমলা মিহিভাবে বলিল, আসবে না কেন—খিড়কী দিয়ে গেল চোখের সামনে। গৌরী রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—চাকর বাকর অবাধ্য হয়েছে দেখেছ!

ডাকলে সাড়া পর্য্যন্ত দেয় না। তা' বলব কাকে বল?

বড়বাবুই চাকর বাকরের মাথা খেলে। এখুনি শম্ভু খিড়কী দিয়ে গেল।

খিড়কীর রাস্তাঘরে পদশব্দ উঠিল। মন্নুর মা বলিল—ওইযে ওইযে বাবু আসছেন।

গৌরী বলিল—এই শম্ভু—বেয়াদপ চাকর কোথাকার—

প্রথমটা না লক্ষ্য করিলেও শিবনাথ খিড়কীর বাগানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়া সব বুঝিয়াছিল—সে হাসি মুখেই জোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—অধম কি একান্তই শম্ভু পদবাচ্য হ'ল হুজুরাইন।

মন্নুর মা মুখে কাপড় গুঁজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ছোট বৌএর চাপা হাসির খুক্ খুক্ শব্দ বেশ শোনা যাইতেছিল। গৌরী নিজেও না হাসিয়া পারিল না—বলিল—মা গো মা কি অপ্রস্তুত করতে পার তুমি মানুষকে—না বাপু—ছি ও কি ?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল—আমার কথাটার উত্তর দাও আমি কি শম্ভুর কেলাসে পড়লাম তা' হ'লে ?

গৌরী স্বামীকে বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল—কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে বল দেখি ? সর্ব্বাঙ্গে ধূলো, শরীরের এই অবস্থা—ছি ছি ছি। বস দেখি, একটু বাতাস করি।

ভোলাদাসী জল দে ত এক বালতী! ছোট বৌ আমার সাবান আর তোমার ভাসুরের গামছা দেখে দাও ত'।

ভোলাদাসী বাড়ীর ঝি।

খেয়ালের সুর চাপা পড়িয়া ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ হয় দেখিয়া শিবনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি সে বলিল—ধীরে মহাশয়া ধীরে, ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ করতে হয় ধীর ভাবে সুস্থ চিত্তে! একটু অপেক্ষা কর, এই গাছ কটা পুঁতে আসি।

গৌরী বলিল—হাত মুখ ধোও জল খাও তারপর। সে স্বামীর হাত হইতে গাছের চারা কয়টা টানিয়া লইল। আর উপায় ছিল না—শিবনাথকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর কিন্তু শিবনাথের মন্দ লাগিল না—তপ্তদেহে শীতল বারি সিঞ্চন, তাহার সঙ্গে পাখার মৃদু বাতাস, সকলের উপর মিছরীর সরবৎ—মন্দ কেন, খুব ভালই লাগিল। সে চোখ মুদিয়া পরম আরামে বলিল—আঃ!

গৌরী বলিল—দেখ কিছুদিন কোথাও গিয়ে শরীর সেরে এস তুমি! আর জামা জুতো পর—ও ছেড়ে আর—

মধ্য পথেই শিবনাথ বলিল—কেন, অমনি আর পছন্দ হচ্ছে না আমাকে!

গৌরী বলিল—আমার কথাই পছন্দ তোমার হয় না। কিন্তু মা থাকলে তিনিও ঠিক এই কথাই বলতেন।

শিবনাথ বলিল—তনয় যগুপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন। কিন্তু, কন্যা কাময়তে রূপং—সখি আশঙ্কা আমার তোমার সম্বন্ধে।

গৌরী এবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমাকে যেতে হবেই। আর জামা জুতো তোমাকে পরতেই হবে।

শিবনাথ উত্তর দিল—শরীর ত' আমার অসুস্থ নয় গৌরী। আর বেশভূষা জীবনের পক্ষে বাহুল্য বলেই মনে করি।

গৌরী বলিল—ও শরীর তোমার ভাঙতে কতক্ষণ? তা ছাড়া শ্রী বলে জিনিষটাও ত' দরকার। আমি টাকা দিচ্ছি। শিবনাথ মুদ্রিত চক্ষেই উত্তর দিল—কি হ'বে রূপ, কি হবে বেশভূষা, মহাকালের দরবারে—

গৌরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

শিবনাথ তবুও একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল—রূপ দেখে যদি ভালবাস সখি—।'

কিন্তু রসিকতা জমিল না, গৌরীর মুখ দেখিয়া গানের কলিটা সে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে পারিল না।

শিবনাথ স্ত্রীর অনুরোধ রাখিল না। তাহার সেই এক উত্তর—কি হবে? সে গ্রামপ্রান্তের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত ধারার চিন্তা করে, লেখে—মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইলে গাছ পোঁতে।

গৌরী অবশেষে দেবর দেবনাথকে দলে টানিয়া শিবনাথকে পরাজিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার ফল কিছু ফলিল, স্থির হইল এখন কয়েক মাস আর এমন করিয়া শিবনাথের ঘুরিয়া বেড়ান হইবে না। বাড়ীতে বসিয়া সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া দিতে হইবে। শিবনাথকে স্বীকার করিতে হইল। কর্ত্তব্যে সে অবহেলা করে না।

গৌরী বলিল—তবু আমার কথাটা রাখলে না!

শিবনাথ বলিল—তোমার কথাইত' রাখলাম।

—না—ভাইএর কথা রাখলে। কেন—সে কথাও আমি জানি।

—কেন শুনি?

—বই ছাপাতে টাকা চেয়েছিলে তুমি—আমি দিইনি—তাই। আমার টাকায় শরীর সারতে পর্য্যন্ত যাবে না তুমি। আমার ব্রতের কাপড় জামা জুতো ছাতা সে পর্য্যন্ত নিলে না তুমি!

শিবনাথ বলিল—পাগল তুমি! গৌরীর কথা তখনও শেষ হয় নাই

সে বলিতেছিল—টাকা দেবার আমি কে? টাকার মালিক ছেলেরা। তারাই মায়ের দৌহিত্র। একথাটা তুমি বুঝলে না, আমার উপর রাগ করলে।

শিবনাথ বলিল—ও তোমার ভুল ধারণা গৌরী। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া আসিল। কিন্তু কথাটা সে চিন্তা না করিয়া পারিল না। বৈঠকখানাটা জনশূন্য—চাকরটা বাজারে গিয়াছে, চাপরাশীটা এই মাত্র গেল দেবনাথের সঙ্গে মাঠে, নায়েব স্থানীয় ব্যক্তি, কি কারণে সে আজ আসিতে পারে নাই। শিবনাথ একা বসিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল।

গৌরী কিছু মাতৃধন পাইয়াছে—হাজার নয় টাকা। টাকাটা কতক ক্যাস সার্টিফিকেটে আবদ্ধ আছে, কতক গৌরীর পিতৃকুলের এক ব্যবসায়ে ধার দেওয়া আছে—সুদটা তাহার মাসে মাসে পাওয়া যায়। কিছু টাকা শিবনাথ একবার চাহিয়াছিল, কিন্তু গৌরী দেয় নাই। শিবনাথ ভাবিতেছিল গৌরীর কথাটা কি সত্য।

চিন্তাটা সুখপ্রদ মনে হইতেছিল না, মনে মনে যেন অপরাধ আংশিক ভাবেও স্বীকার করিতে হইতেছিল। শিবনাথ উঠিয়া সেরেস্তার খাতাপত্রগুলা লইয়া বসিল।

কাহার জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া শিবনাথ দেখিল এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আসিতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—নমস্কার।

শিবনাথও প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল—বসুন। বসিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—নতুন বহাল হয়েছেন বুঝি আপনি।

নগ্নগাত্র শিবনাথ বুঝিল ভদ্রলোকের ভুল হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়, তাই সে দ্রুত চিন্তা

করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ভদ্রলোক তাহার হাতদুটী জোড় করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—পাঁচটি টাকা আপনাকে পান খেতে দোব নায়েব বাবু। আমার একটী কাজ ক'রে দিতে হবে।

শিবনাথ অগাধ জলে পড়িয়া গেল। দুই কুল বজায়ের উপায় না পাইয়া সে নায়েব সাজিয়াই বসিল।

বলিল—কি কাজ বলুন।

ভদ্রলোক বলিল—বাবুদের দরবার থেকে পাঁচ টাকা ক'রে বার্ষিক বৃত্তি ছিল আমাদের। গত বছর থেকে সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন বড়বাবু। তা সেইটী আপনাকে উদ্ধার করে দিতেই হবে।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—বৃত্তি বন্ধ হ'ল কেন? বড় বাবু ত'—

বিরক্তিভরে ভদ্রলোক বলিয়া বসিল—আরে মশায়, নতুন লোক আপনি—ক্রমে বুঝতে পারবেন। সে এক আচ্ছা লোক। এখন ব্যাপারটা শুনুন। বাবুদের মহাল ২১৯ নং তৌজি পাবনায় আমার শ্বশুর বাড়ী—বৃত্তি আমার শ্বশুরদের পৈত্রিক। আমিই সব সম্পত্তি পেয়েছি—শ্বশুরের ছেলে পিলে নেই। শ্বশুরের পৈত্রিক দুর্গাপূজা ছিল; বিজয়ার পর যাত্রার দিন আমার শ্বশুর প্রতিমার গলার পৈতে নিয়ে আসতেন—বাবুরা পাঁচটী করে টাকা দিতেন। এখন এবার আসতেই ছোটবাবু বললেন—বৃত্তি আপনি পাবেন না; কেন মশায়, জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম শ্বশুরের দুর্গাপূজো ত আমি আর করি না। সেই জন্যে বড়বাবুর হুকুম।

শিবনাথের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল! সে বলিল—পূজোটা বন্ধ না করলেই হ'ত।

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিল—বেশ মশাই আপনি! খরচ কত! তা ছাড়া ইস্কুল মাস্টারী করি, ছুটী হয় সেই পঞ্চমীর দিন কখনই বা কি করি।

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল তা আমি বলব বাবুকে।

ভদ্রলোক বলিল—হাঁ্যা—ছোটবাবুকে নয় বড়বাবুকে বলবেন। আচ্ছা ঘড়েল লোক মশাই—ছোট ভাইকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে আড়াল থেকে হুঁঃ—বেশ! আরে মশাই পাঁচ দিন এসে দেখাই পেলাম না। কোথা? না, বাড়ী নাই—মাঠে—নয় বাগানে।

তারপর সহসা মুখটা খুব কাছে আনিয়া বলিল—এত বাগানে কেন মশাই, বলি মালটাল—এঁ্যা? এদিকে ত স্বদেশীতে জেল টেল খেটে এলেন।

শিবনাথের এবার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল—সে কোনরূপে বলিল—কই সে রকমত শুনি টুনি নি। চোখের ইসারা করিয়া ভদ্রলোক বলিল—আরে মশাই ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না।

শিবনাথ ভদ্রলোককে বিদায় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এখনি কে হয় ত আসিয়া তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়া দিবে। সে বলিল—আমি বলব—আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক আবার তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে বলব বললে হবে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি উদ্ধার করে দিতেই হবে। আমি বরং আরও কিছু—। বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—আমাকে কিছু লাগবে না। তবে বড়বাবু যে ধারার মানুষ—

ভদ্রলোক বলিল—আরে, দেখা পেলে যে দেখি কি ধারার মানুষ। বুড়োছেলে শাসন করা অভ্যেসও আমার আছে। এই দেখুন দশটাকা দোব আমি। আচ্ছা চল্‌লাম আজ—নমস্কার।

ভদ্রলোক চলিয়া যাইতেই শিবনাথ তক্তাপোষের উপর গড়াইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। একা একা এতটা কৌতুক ভোগ করিতে তাহার ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। শিবনাথের বাড়ী ও বৈঠকখানার মধ্যে খানিকটা ব্যবধান আছে—একটা রাস্তা পার হইয়া সামান্য একটু যাইতে হয়। বৈঠকখানা হইতে রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই ভদ্রলোক তাহারই এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বন্ধুটী বলিয়া উঠিল —এই যে শিবনাথ। এই ভদ্রলোক—ও মশায়, ও সীতারামবাবু—চলে যাচ্ছেন কেন, এই যে শিবনাথ।

সীতারামবাবু ততক্ষণে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে অনেকটা চলিয়া গিয়াছেন।

শিবনাথের হাসিতে নূতন জোয়ার ধরিয়া গেল। তবুও সে ডাকিল— শুনুন, শুনুন, সীতারামবাবু!

অল্প দূরেই পথটা একটা মোড় ফিরিয়াছে। সীতারামবাবু সেই মোড়ের মধ্যে তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুটী হতবাক হইয়া শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—কি ব্যাপার বল ত' শিবনাথ— ভদ্রলোক আমার জানা লোক। তাই দেখা হইতেই বল্লেন, শিবনাথবাবুকে

ধ'রে একটা কাজ ক'রে দিতে 'হবে আমার। তাই সঙ্গে আসছিলেনও আমার, কিন্তু তোমাকে দেখেই—; কি ব্যাপার বলত ?

শিবনাথ তখনও প্রচুর হাসিতেছিল—সে হাসির মধ্যেই কোনরূপে বল্লিল—প'রে বলব দাদা—এখন হাসতে দাও !

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতেই বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ীর সকলেও হাসিয়া আকুল হইল। গৌরী, ঘরের মধ্যে লক্ষীর সিংহাসন পরিষ্কার করিতেছিল ! সে গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ীর পুরাতন ঝি সতীশের মা বলিতেছিল—তা' বাপু লোকের দোষ কি ! বাবু লোকের চেহারা হবে এ্যাই থল্‌থলে—এই ভুঁড়ি ! এ্যাতখানি জায়গা জুড়ে ব'সে থাকবে পাহাড় পর্ব্বতের মতন ! এই জামা, চক্‌চকে জুতো, মস্ মস্ করে যাবে ! তা-না কি এক ঢং বাপু তোমার।

শিবনাথ গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—শুনলে হাসির কথা !

কাজের অজুহাতে ওঘরে যাইতে যাইতেই গৌরী উত্তর দিল—কালা ত' নই শুনলাম বৈ কি ! কিন্তু হাসির ত' এতে কিছু নাই।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—কি রকম ?

—তা' বৈ কি। আড়িপেতে শোন যদি তবে নিরেনব্বুইজনকে অমনি ধারার কথা বলতে শুনবে। নিজের পরিচয় গোপন ক'রে নিজের সম্বন্ধে কথা শোনাও আড়িপাতারই সামিল। ও অতি ছোট কাজ।

গৌরীর কথার সুরে ও অর্থে বাড়ীর হাস্যচটুল বায়ুস্তর যেন দেখিতে দেখিতে স্তব্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। শিবনাথও মনে যেন একটু আঘাত পাইয়াছিল—তবুও সে রহস্য করিবার

চেষ্টা করিল—হতভাগ্য শিবের কপালে পতিনিন্দা শুনে গৌরীও শেষে সতীর মত দেহত্যাগ না করেন—আমি ভাবছি !

গৌরী শান্তস্বরে উত্তর দিল—দেহত্যাগ করে আর লাভ কি বল ? গৌরী দেহত্যাগ করলে মহাদেব আবার বিবাহ করবেন মাঝখান থেকে গৌরীর কার্ত্তিক গণেশই ভেসে যাবে।

কথাগুলির গঠনের ভঙ্গীতে রহস্য বলিয়াও ধরা যায়—কিন্তু অতি কুৎসিত ব্যক্তির রোদন-বিকৃত মুখ দেখিয়া যেমন হাসা যায় না—তেমনি এ কথাগুলি শুনিয়াও কেহ হাসিতে পারিল না। শিবনাথও নীরব হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বলিল—এত রূপের আকাঙ্ক্ষা কেন বল ত' তোমার ?

অতি রুষ্ট কণ্ঠস্বরে গৌরী উত্তর দিল—এত বড় জঘন্য কথাটা তুমি বললে আমাকে ! অতি ইতর তুমি !

শিবনাথের কর্কশ কৃষ্ণমূর্ত্তি ক্রোধে কুৎসিত হইয়া উঠিল—সে বলিয়া উঠিল—যা সত্য তাই বলেছি। সত্য কথা ইতরে বলে না—ইতরেই সত্যকথা সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে না !

পাচিকা মন্তুর মা বলিল—তা বাবু একবার ঘুরেই আসুন না। বৌদিদি ত' ভাল কথাই বলছেন !

শিবনাথ উত্তর দিল—সে খরচ করবার মত অবস্থা আমার নয়। তার চেয়ে স্নো-পাউডার মেখে রূপ বাড়ান কম খরচে হয়। বলিতে বলিতেই সে উঠিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

ইহার পর দুইবৎসর চলিয়া গেছে। শিবনাথ তখন খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। দুই চারিখানা কাগজের লেখার তাগিদ-পত্রের জবাব তাহাকে নিত্য দিতে হয়। পরিশ্রমও সে করে অগাধ। কিন্তু গাছের নেশা—উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে মাঠে ঘোরার নেশা, বেশভূষায় উদাসীনতা এখনও তাহার তেমনি আছে।

সেবার বর্ষার সময় খেয়াল হইল ঘর মেরামতের। রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া নয়—রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কিনিয়া সে নিজেই কাজ আরম্ভ করিল। বাগানের ভিতর দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশের পথ ছিল না—সেখানে সে পাঁচীল ভাঙ্গিয়া এক নূতন ফটক ও একপ্রস্ত সিঁড়ির প্রয়োজন অনুভব করিল। আর তৈয়ারী করিতে হইবে বাগানের মধ্যে একটা পাকা বেদী।

ছোট ভাই বলিল—তোমার অদ্ভুত খেয়াল দাদা। বেশ ত' রাজমিস্ত্রী লাগান হোক।

শিবনাথ নিজের হাতেই বনিয়াদ খুঁড়িতেছিল। সে বলিল—উঁহু। দেবনাথ জানে এ লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা; সে দাদাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে গিয়া গৌরীকে ধরিল—পার ত' তুমি পারবে বৌদি—তুমি বল।

গৌরী বলিল—পাগল তুমি দেবু! মহাপুরুষ যারা হয় তাদের ঐ ধারা! কারও কথা তাদের রাখতে নাই। আমি পারব না ভাই, আমাকে ব'ল না।

দেবু বলিল—প্রজা-সজ্জন আসে যায়—তারা দেখলে কি বলবে বল ত'? মাথার ওপরে এই কড়া রোদ, কখনও বৃষ্টি!

গৌরী বলিল—তারা হীন ব্যক্তি—তাদের বলা কওয়ায় কি আসে

যায়! আর রোদ বৃষ্টি প্রকৃতির দান, ওতে কি শরীরের অনিষ্ট হয়! তা' ছাড়া খালি গায়ে, খালি মাথায় রোদ বৃষ্টিতে মহাপুরুষদের কষ্টও হয় না।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। গৌরী জল খাবার সাজাইয়া একখানা রেকাবী দেবুর হাতে দিয়া বলিল—খাইয়ে এস দেখি। চাকর বাকরের হাতে দেওয়া ত' মিথ্যে—পড়েই থাকবে।

*　　*　　*　　*

পনের দিনেও সিঁড়িটা শেষ হইল না। সেদিন সকালে শিবনাথ মাথায় এক মাথালী দিয়া সিঁড়ির উপর সিমেণ্ট চালাইতেছিল। পনের দিনেই রৌদ্রে তাম্রাভ রংএ তাহার কাল ছোপ ধরিয়াছে—পিঠখানার রং গাঢ় কাল হইয়া উঠিয়াছে।

পিওন আসিয়া প্রশ্ন করিল—এই, বাবু আছেন রে?'

শিবনাথ মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে—চিনতে পারি নাই আপনাকে। একটা রেজেষ্ট্রী আছে, খারিজ ফিজের নোটীশ!

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া সে হাসিয়া বলিল—রেজেষ্ট্রী ছোট বাবুকে দাও গে যাও।

চিঠিগুলোয় কয়খানা কাগজের পত্র, একখানা তাহার মামার, অপর খানা দিয়াছেন তাহার ভগ্নীপতি। ভাগ্নীর বিবাহ আগামী সপ্তাহে, তিনি তাহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। দিদিও পত্র দিয়াছেন—এবার দেবুকে পাঠাইলে চলিবে না। তাহাকেই আসিতে হইবে। অন্যথায় তিনিও কখনও আর শিবুর বাড়ী আসিবেন না।

শিবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। ভগ্নীপতির দেশ বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে—রেল ষ্টেশন হইতে মাইল পাঁচেক দূরে যাইতে হয়। কাঁচা রাস্তা বর্ষার জলে কাদায় অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পৌঁছিবামাত্র ভগ্নীপতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন—এস এস ভাই এস। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার, শিবু! খালি পা—খালি গা—এ কি!

শিবু হাসিয়া বলিল—চাষার চেহারা আবার কবে সজ্জনের মত হয় জামাইবাবু! এই ত' চাষীর পোষাক।

ভগ্নীপতি উপস্থিত ভদ্রলোক কয়টীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ডাক্তার বাবু, ইনিই হলেন আমাদের প্রিয় লেখক শিবনাথ—আমার তালব্যশয়ে আকার লয়ে আকার। কেমন হে? আর ইনি—

তৎপূর্ব্বেই ডাক্তার বাবুটী আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার পরিচয়—এ ভিলেজ ডক্টর, সামান্য ব্যক্তি। ভারী সুখী হলাম! ভারী ভাল লাগে আপনার লেখা। আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে কিন্তু একদিন যেতে হবে আপনাকে।

ভগ্নীপতি বলিলেন—হবে ডাক্তার হবে। ওকে এখন পনের দিন ছাড়ব মনে করছ? তবে চোয়াড়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে কি করবে! চল হে, বাড়ীর ভেতরে চল—দিদি তোমার দশবার খোঁজ করেছে এর মধ্যে—শিবু এল?

শিবু বলিল—যে রাস্তা আপনাদের!

বাড়ীর মধ্যে দিদি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—এ কি দশা হয়েছে তোর শিবু?—এ্যা সেই শিবু তুই! বলে না দিলে ত' তোকে আমি চিনতেই পারতাম না। বৌ লেখে শরীর খারাপ হয়েছে তোর,

কিন্তু এত খারাপ! সে রাক্ষুসী সেবা যত্ন করে না নাকি? বস বস আমি বাতাস করি। আর এ কি পোষাক পরিচ্ছদের শ্রী রে তোর।

শিবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—এক কাপ চা দাও দেখি আগে!

দিদি ডাকিয়া বলিলেন—অ' ভাই বিনী—চায়ের জল চড়িয়ে দাও ত'। আর ওরে নবীন—হাত মুখ ধোবার জল দে।

ওদিকের বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখেই কতকগুলি ঝিউরী মেয়ে—তাদের পিছনে কতকগুলি বঁধু। দিদি বলিলেন—মেয়েরা সব দেখতে এসেছে তোকে। আমাদের এখানে লাইব্রেরীতে তোর বই সব আছে কি না—আর সব কাগজই আসে ত'।

শিবু হাসিয়া বলিল—তা' ছাড়া তোমার মত সজীব বিজ্ঞাপন যখন রয়েছে, তখন এখানে শিবুর খ্যাতির অভাব কি?

দিদি বলিল—না রে না, আমি মিথ্যে বড়াই ক'রে বেড়াই না। কিন্তু ও চেহারায় তোকে দেখবে কি বল্ ত'?

শিবু বলিল—ভয় কি দিদি। জামাইবাবুর অনূঢ়া ভগ্নী ত' নাই যে এই চেহারায় বরমাল্য গলায় নিতে হবে—টোপর পরতে হবে!

শিবুর মাথায় এক চপেটাঘাত করিয়া ভগ্নীপতি বলিলেন—ওরে শালা আমাকে পাল্টে শালা বলতে চাও তুমি!

দিদির ননদ বিনী বা বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া এক কাপ চা হাতে দিয়া বলিল—দুধ বেশী হয়ে গেছে, গরমও নেই, শিগ্‌গির খেয়ে নিন।

দিদি বলিল—খাসনে শিবু খাসনে—মাড় মাড় চা নয়।

তাহার পূর্ব্বেই শিবু চুমুক দিয়াছিল—সেটুকু ফেলিয়া দিয়া শিবু

বলিল মাড় খুব পুষ্টিকর জিনিষ, সেণ্ট পারসেণ্ট ভিটামিন। আর আমার মত চাষার পক্ষে উপযুক্ত বস্তু। সকলে হাসিয়া উঠিল।

* * * *

শিবনাথের উপর পড়িল বরযাত্রী সম্বর্দ্ধনার ভার।

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—দেখো ভাই, শহুরে জীব সব—তার ওপর আসছেন বরযাত্রী, বিজয়ী প্রুসিয়ান সৈন্যের মত বিক্রমে আসবেন। প্রথম মোহড়া তোমাকেই নিতে হবে।

মাথায় এক তোয়ালে জড়াইয়া শিবু যাইবার জন্য সাজিল, বলিল—কোন চিন্তা নাই আপনার। খান দশেক গো-গাড়ী ও খান দুয়েক পাল্কী লইয়া শিবু স্টেশন হইতে বরযাত্রী আনিবার জন্য যাত্রা করিল। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক হাঁটু করিয়া কাদা জমিয়াছে। শিবু যখন স্টেশনে পৌছিল তখনও ট্রেণের বিলম্ব ছিল। একজন খাবারওয়ালাকে ধরিয়া সে চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

বরযাত্রীর দল স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাদা! এ কি দেশ বাবা! এ কথাতো ছিল না!

শিবু যোড় হাত করিয়া বলিল, এই আমাদের দেশ। তবে কষ্ট বিশেষ করতে হবে না, যেটুকু কষ্ট ঐ দোকান পর্য্যন্ত। ওখানে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠবেন, বাড়ীর দোরে নামবেন।

একজন বলিল—বলিহারি ইয়ার! জুতোর কাদা ঘুচোবে কে?

বরকর্ত্তা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন,—করবে কি আর, উপায় কি! এক কাজ কর, জুতো খুলে ফেল সব।

তরুণ দলের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল জুতো হাতে করে বরযাত্র যাওয়া এ ত' নতুন।

বরকর্ত্তা বলিলেন—তোমরা জুতো হাতে করবে কেন—ঐ যে চাকর না সরকার ওকেই দাও সব! এই জুতোগুলো সব নাও হে তুমি। একখানা বস্তা আন' বরং।

শিবু অদূরবর্ত্তী একজন গাড়োয়ানকে ডাকিল—ওরে।

একজন বরযাত্রী তাহার মাথায় সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ওকে বলা হ'ল ত' উনি আবার বলেন ওকে। নে বেটা তুই নে না। তোকেই নিতে হবে।

ভাবী বৈবাহিক তখন ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের মত গোঁফ ফুলাইয়া বলিতেছেন—লোক নাই জন নাই কি ব্যাপার সব? পাড়াগাঁয়ের ভদ্রলোক means হাফ চাষা।

শিবু হাসিমুখেই বস্তা ঘাড়ে লইয়া জুতা সংগ্রহ করিতেছিল। সে বেয়াইকে বলিল, আপনার জুতো জোড়াটা!

দোকানে আসিয়া আর এক হাঙ্গামা, ভাঁড়ে চা কি ভদ্রলোকে খায়!

শিবু বলিল—আজ্ঞে কাপের চেয়ে ভাঁড় অনেক ভাল—কাপে কত জনে খায়—সেই।

একজন বলিয়া উঠিল—আচ্ছা ইম্পার্টিনেণ্ট চাকর ত—দে ত' রে বেটার কান মলে!

শিবুর সঙ্গে চাপরাশী ছিল জন কয়েক। তাহারা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইসারা করিয়া শিবনাথ তাহাদিগকে নীরব থাকিতে আদেশ করিল। যাই হোক নেশার বস্তু চা এবং সে চা যখন আঝ রাস্তার মধ্যে পাওয়া

খাইবে না, তখন অগত্যা ভাঁড়েই খাইতে হইল! ভাঁড়ে চা বিস্বাদ লাগিল কিনা সে প্রশ্ন করিতে শিবু সাহস করিল না! গাড়ীতে উঠিবার সময় জুতা চাই—শিবনাথ পূর্ব্বেই জুতোগুলি জোড়া মিলাইয়া সারিবন্দী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বরযাত্রীরা বলিল—পায়ে যে কাদা, জুতো পায়ে দি কি ক'রে?

শিবু গাড়োয়ানদের হুকুম করিল—জল এনে দে, বাবুরা পা ধোবেন।

একজন গাড়ীতে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এইখানে পা ধুয়ে দাও বাবা, কাদার ওপরে পা ধুয়ে ফল কি!

সহযাত্রীরা তাহাকে তারিফ করিয়া উঠিল—দি আইডিয়া! ব্রেণ কি রে বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাড়ীতে চড়িয়া পা বাড়াইয়া বসিল। গাড়োয়ান পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিতে উদ্যত হইতেই বরযাত্রীটি বলিয়া উঠিল—থাক্—থাক্। শোন ত' হে ইয়ার খানসামা, শোন ত'!

শিবনাথ কাছে আসিতেই সে বলিল, খোল ত' বাপধন মাথার তোয়ালে খানি, মোছ পা মুছে দাও।

একে একে সকলের পা মুছিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতেই সে গাড়ীর সঙ্গ ধরিল। গাড়ীতে স্থান তাহাকে কেহ দিল না; অগত্যা সে একজন গাড়োয়ানের স্থানে বসিয়া পাঁচন হাতে গরু ঠেঙাইতে বসিল—হেৎ-তা-তা বাপধন রে আমার!

ভগ্নীপতি গোপাল বাবু বলিল—ব্যাপার কি হে শিবু, চাপরাশীরা বল্লে আমায়—ওরা নাকি তোমার মাথায় চড় মেরেছে, জুতো বইয়েছে—

হাসিয়া বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—যেতে দিন না জামাইবাবু, ও সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে কি শুভকর্ম্মে একটা ব্যাঘাত ঘটাবেন ?

সজল চক্ষে গোপালবাবু শুধু বলিল—ভাই শিবু !

শিবনাথ তাড়া দিয়া বলিল—যান—যান কাজে যান। কোথায় কি একটা হয়ে যাবে শেষে। আপনাকে হয় ত, কান নাক মলিয়ে ছাড়বে।

গোপালবাবুও এবার অল্প একটু হাসিয়া বলিল—তোমাকেই ডাকতে এসেছি—আলাপ করবেন বেয়াই মশায়। উনি আবার সাহিত্য-রসিক লোক কিনা।

শিবু বলিল—না—না, সে হয় না জামাইবাবু। ভারী অপ্রস্তুত হবেন ওঁরা। গোপালবাবু বলিল—তুমি না গেলে হয় ত' ভাববে তুমি রাগ করেছ, কারণ, জানতে ওরা পারবেই যে তুমিই স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে।

শিবুকে দেখা দিতে হইল।

গোপালবাবু শিবুকে সঙ্গে লইয়া আসরে আসিয়া পরিচয় দিতেই গমগমে গরম আসরখানায় কে যেন জল ঢালিয়া দিল। বরযাত্রী সকলেরই মুখ কাল হইয়া গেল। বরকর্ত্তা উঠিয়া আসিয়া যোড় হাতে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শিবু বলিয়া উঠিল—ডিটেক্‌টিভ নভেল লিখব বে'ই মশাই, তাই ছদ্মবেশ প্রাক্‌টীস করছি।

তুচ্ছ রসিকতা, কিন্তু ইহাতেই সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর কিন্তু দুরন্ত বরযাত্রীর দল সুবোধ বালক হইয়া গেল—যাহা পাইল তাহাই খাইল—যাহা অনুরোধ করা হইল তাহাই রাখিল।

বাড়ীতে আসিয়া একথা শিবনাথ প্রকাশ করিল না—গৌরীর উষ্মা আশঙ্কা করিয়া।

সেদিন সে পড়িবার ঘরে বসিয়া একখানা সাপ্তাহিকের একটা প্রবন্ধ পড়িতেছিল। প্রবন্ধটা গল্প সাহিত্যের উপরে লেখা—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। গৌরী ঘরে ঢুকিয়া একখানা খোলা চিঠি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শিবনাথ দেখিল, দিদি লিখিয়াছেন চিঠিখানা। সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে গৌরীকে তিরস্কার করিয়াছেন—তুমি নিশ্চয়ই শিবনাথের সেবা যত্নে মনোযোগী নও। রত্ন পাইয়া তুই চিনিলি না পোড়ারমুখী!

শিবনাথ মুখ তুলিয়া গৌরীর দিকে চাহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হঁ্যা, বলিনি তোমাকে আমি।

অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া গৌরী কহিল—তুমি চেঞ্জে যাবে কি না বল? নইলে—। কথা তাহার অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

শিবু বলিল—আবেগ ভাল নয় গৌরী, শোন, আমার কথা শোন!

গৌরী চোখ মুছিল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল। সে বলিল—

লোকে তোমায় চাকর ভেবে অপমান করে—কতজনে কত কথা বলে। ও বাড়ীর হরির বৌ সেদিন কি বল্লে জান, বল্লে—দিদি, বড়ঠাকুর কি নেশা টেশা করেন যে এমন পাক দেওয়া—।

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

শিবু হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার মিথ্যে দুঃখ গৌরী!

গৌরী বলিল—না মিথ্যে নয়। নিজের স্বামী—সন্তান কুৎসিত হলেও কেউ সে কথা বল্লে বড় দুঃখ হয়। বুলুর কথা কি মনে নেই তোমার?

শিবু চমকিয়া উঠিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার মনে পড়িয়া গেছে। গৌরী বলিল—বুলুর কথা ত' তোমার ভোলবার নয়।

বুলু শিবনাথের মৃতা কন্যা। মেয়েটি শিবনাথের বড় প্রিয় ছিল।

কিন্তু সে ছিল কাল, তাহার উপর চোখ দুটি ছিল ছোট ও ট্যারা।

গৌরী বলিল—মনে পড়ে তোমার, গাঙ্গুলী বাবুদের ঠাকুরবাড়ী থেকে যে দিন সে কাঁদতে, কাঁদতে—।

ঝর ঝর করিয়া গৌরী নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবনাথের মনশ্চক্ষের উপর ছবিটি ভাসিয়া উঠিল।

শিবনাথ বসিয়া জল খাইতেছিল সেদিন। অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে চার বছরের মেয়ে বুলু আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে লইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল মা—কে মারলে তোমাকে?

বুলু উত্তর দিতে পারিল না—চোখের জলে বুকের দুঃখ তখনও তাহার নিঃশেষিত হয় নাই। উত্তর দিল গঙ্গা, শিবনাথের বড় মেয়ে—সে বলিল—ওই ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিলাম আমরা পূজো দেখতে। তাই ওদের গিন্নী বল্লে, এই কাদের ছেলে তুই? স'রে যা! তা' আমি বল্লাম—ও—আমার বোন। তাই ওরা কি বল্লে জান বাবা—বল্লে—শিবুর মেয়ে! ওমা কি কুচ্ছিৎ হয়েছে এটা, চোখ দুটো আবার দেখ! শিবু বিয়ে দেবে কি ক'রে গা! বুলু ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। রাস্তা থেকে কাঁদতে কাঁদতে আসছে!

শিবনাথের মনে পড়িল, সে দিন সে বলিয়াছিল—মিথ্যে কথা মা,

ওরা মিথ্যে কথা বলেছে ; এই দেখ তুমি—আমার চেয়ে কত সুন্দর তুমি !

বুলু সান্ত্বনা পাইলেও শিবনাথের কথা বিশ্বাস করে নাই, সে বলিয়াছিল—বাবা তুমি কাল, আর আমি কাল ! ওরা সব সুন্দর !

গৌরী তখন বলিতেছিল—সে আঘাত আমি জীবনে ভুলব না। তুমিও ত' সে দিন কেঁদেছিলে।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভুলি নি গৌরী !

গৌরী বলিল—তুমি হাস, কিন্তু আমার বুকে তেমনি আঘাত লাগে ! তোমার খ্যাতিতে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শ্রীতে আমার বেশী তৃপ্তি।

শিবনাথ গৌরীর হাতখানি টানিয়া আপনার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—এখানটা বড় ধরেছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও ত'।

গৌরী নীরবে স্বামীর ঘাড়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আরামে শিবনাথের চোখ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাথাটি হেলাইয়া সে গৌরীর বুকের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—আজ থেকে তোমার হাতেই সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম গৌরী। যা করবার তুমি কর।

চোখে জল মুখে হাসি মাখিয়া গৌরী বলিল—তা হ'লে আসছে সপ্তাহেই দিন দেখাই !

এবার চোখ খুলিয়া চোখে চোখ মিলাইয়া শিবু বলিল—কিন্তু আমি সুন্দর হ'লে আমাকে দেখে তোমার মনে কি বেশী আনন্দ হবে ?

গৌরী আরক্তিম হইয়া উঠিল, বলিল—হবে, এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হবে।

ভ্রমণ কাহিনী

'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী—বেলা দ্বিপ্রহর'—অর্থাৎ যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ, তবে সেইদিন দ্বিপ্রহরে নয়, পরদিন সন্ধ্যায় যাত্রা করিবার কথা। নানাদিক হইতে নানা জনের উপদেশ বর্ষণের আর বিরাম ছিল না। আজকালকার দিনে উত্তরাপথ ভ্রমণ এমন একটা বিপদ-সঙ্কুল সুদীর্ঘ ভ্রমণ নয়, তবু বাঙালীর ঘর এখনও বাঙালীর ঘর, বাঙালীর মেয়ে এখনও বাঙালীর মেয়ে। স্নেহ-প্রবণতায় আশঙ্কায় নানা অসম্ভব কল্পনা করা বাঙালীর মেয়ের অন্তরের একটা বিশিষ্ট পরিচয়।

আশঙ্কার পরিমাণটা সকলের চেয়ে বেশী আমার পিসীমার। ট্রেণ কলিশন, বিদেশে কঠিন ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা, এমন কি কোন অপরিচিত পথে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনার আশঙ্কাও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এই বয়সে তোমার তীর্থধর্ম্ম করার কি যে সব হ'ল তা বুঝলাম না বাবা। আমার বাবা চুরাশী বছর বয়সে তীর্থে গিয়েছিলেন।

কোন তর্ক না করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—ভয় কি

পিসীমা, আজকাল পথে কি আর কোন ভয় আছে? ঘরে আর পথে কোন তফাৎ নাই!

স্ত্রী একটি সিগারেটের টিন পানের মসলায় ভর্ত্তি করিয়া স্যুটকেসে পুরিয়া দিয়া বলিলেন—কৌটোতে পানের মসলা রইল, যেখানে সেখানে পানটান খেয়োনা।

'আ'কারের উপর জোর দিয়া প্রশ্ন করিলাম, পানওয়ালার হাতেও না?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন—মানে?

—মানে—পানের দোকানদার যদি নারী না হয়ে পুরুষ হয়—তার হাতেও না?

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, ঠাট্টার কথাটা কি বলেছি, শুনি? বিদেশী লোক দেখে যদি পানের সঙ্গে—

বাকীটা আমিই বলিয়া দিলাম, বেশ গম্ভীরভাবেই বলিলাম—হ্যা তা বটে, বিষ-টিষ কিছু দিয়ে দেয়।

আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

প্রত্যুত্তরে তিনি দুম্ দুম্ শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাহাকে বলে পলাইয়া বাঁচিলাম। ফুটানো জল ঠাণ্ডা হইতে যত সময় লাগে তাহার দ্বিগুণ সময় বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম দেখিলাম ঠাণ্ডা হওয়া দূরের কথা গোটা বাড়ীটাই টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে! একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেছে।

আমার মা শহরের মেয়ে, তা ছাড়া দৃষ্টির প্রসারতাও সাধারণ মেয়েদের

চেয়ে অনেক বেশী—দেখিলাম, তিনি পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। শুধু যোগ দেওয়া নয়, তিনিই দেখিলাম সভায় নেত্রীপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছিলেন—কবরেজ মশায় কাশী থেকে এসে মোগলসরাই মুসাফিরখানায় ট্রেণের জন্যে বসে আছেন, এমন সময় একটি লোক এসে বলে, বাবু পেঁড়া নেবেন। লোকটা খুব গরীব আর লোকটার পেঁড়াগুলি দেখে খুব ভাল বলেই মনে হল। তবুও কবরেজ বললেন—না দরকার নাই। লোকটা তখন খুব কাকুতি-মিনতি করে বললে—বাবুজী আমি খুব গরীব, বাড়ীতে খুব যত্ন করে পেঁড়া তৈরী করে বেচি—তাতেই আমার দিন চলে। অল্প দু একটাও যদি নিতেন বাবু। লোকটার কথা শুনে কবরেজের মায়া হল—আর তাঁর ক্ষিদেও পেয়েছিল, তিনি দুটো পেঁড়া কিনলেন। লোকটা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি নিজের থালাটা নামিয়ে কবরেজের কাছে লোটা চেয়ে নিয়ে জল এনে দিলে তারপর এ গল্প সে গল্প করে কবরেজের কাছে বসল। একটু পরেই কবরেজ ঘুম পেয়েছে বলে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লেন। তারপর আর কবরেজের কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি রেল-হাসপাতালে। ব্যাচারার ব্যাগ নাই—গায়ের জামা নাই —এমন কি পরণের কাপড়খানা পর্য্যন্ত পাল্টে একখানা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। লোকটা পেঁড়ার সঙ্গে বিষ দিয়েছিল।

ঘটনাটি সত্য, সে আমিও জানি। হাতকাটা কবিরাজ মহাশয়ের ঘটনা পাটনা সহরে সর্ব্বজনবিদিত। মা সবটা বোধ হয় জানেন না, জানিলে হাতকাটা যাওয়ার কথাও বলিতেন। ভদ্রলোক প্রথম চেতনা পাইয়া পাগলের মত প্লাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, কোন কথা তাঁহার

মনেও ছিলনা। সেই অবস্থায় লাইন পার হইতে গিয়া লাইনের ধারে পড়িয়া যান। দৈবের কৃপায় জীবন রক্ষা হইল কিন্তু একখানা হাত লাইনের উপর পড়িয়াছিল—সেখানা তাঁহার কাটা গেল।

সে ভ্রমটুকু ইচ্ছা করিয়াই সংশোধন করিয়া দিলাম না—চাপিয়া গেলামণ একান্ত নিরীহের মত বলিলাম—ওঃ সে অনেক দিনের কথা, এখন আর ওসব জোচ্চুরি চলে না।

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—না, চলে না! তুমি তীর্থে যাবে ব'লে সব চোর জোচ্চোর সাধু হয়ে উঠেছে।

মা বলিলেন, কাজ কি তোমার যেখানে সেখানে পান খেয়ে কি খাবার খেয়ে। পৃথিবীতে সাধুর চেয়ে পাপীর সংখ্যাই বেশী।

এ কথাটা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলাম। সাবধানে থাকিব না এমন সংকল্প মুহূর্ত্তের জন্যও মনের কোণে স্থান না দিলেও পিসীমা, মা এবং স্ত্রী প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্র প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছুটি পাইলাম।

*　　*　　*　　*

লুপলাইনের পথে যাত্রা, পথে প্রথমেই নামিলাম গৈবীনাথে। একেবারে মাঝগঙ্গায় দ্বীপের মত একটি শিলাস্তূপ মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই উপর ছোট ছোট মন্দির। শিলাস্তূপের পাথর কাটিয়া কয়টি গুহাও প্রস্তুত করা হইয়াছে। শিলাস্তূপটির চারিপাশে ছোট ছোট গুল্ম ও কতকগুলি ছোট গাছ স্থানটিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। গঙ্গার তরঙ্গ-বেষ্টনীর মধ্যে তপোবনের মত দেবস্থানটী বড় ভাল লাগিল; যাই যাই

করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত একটা ট্রেণ ফেল করিয়া একেবারে সন্ধ্যায় স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম।

সংকল্প ছিল এখান হইতে যাইব মুঙ্গের। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম, মুঙ্গের গিয়া পৌছিব রাত্রি এগারটায়। মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিয়া উঠিল, অপরিচিত স্থান—রাত্রি এগারটা। পরক্ষণেই আপন মনেই একটু হাসিলাম, সংক্রামক ব্যাধির বীজ মনোদেহে প্রবেশ না করিয়া ছাড়ে নাই। শুধু প্রবেশ করা নয়, বেশ চাপিয়া ধরিয়াছে দেখিতেছি! জোর করিয়া সংকল্প করিলাম—মুঙ্গের যাইবই। মুঙ্গেরের টিকিট কিনিয়াই গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাধির শক্তি; জামালপুর আসিয়া মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম; প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর ক্রমশ বর্দ্ধিততর শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সমগ্র মনটাকে পরিব্যপ্ত করিয়া যে আমাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিল ভাবিলে আজও আশ্চর্য্য হইয়া যাই। জামালপুরে পাটনার একখানা টিকিট করিয়া ঐ গাড়ীতেই রওনা হইয়া গেলাম। মুঙ্গের পিছনে পড়িয়া রহিল।

কিউল জংশনে আসিয়া নামিতে হইল। মেন লাইনের ট্রেণ রাত্রি তিনটার পর। ঘড়ি দেখিলাম, এখন সবে দশটা। এখন শীতের রাত্রি, কোথায় কাটাই? থার্ডক্লাসের মুসাফিরখানাটার চারিদিক খোলা, উপরে টিনের আচ্ছাদন, অদূরবর্ত্তী নদীটার জলো হাওয়া হুহু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। বাতাসে শিশিরকণা আচ্ছাদনীর টিনে লাগিয়া বৃষ্টিধারার মত টিন বাহিয়া নীচে পড়িতেছে। কুলিটা বলিল—বাবুজি, ধরমশালায় যাবেন? আচ্ছা মোকাম, খুব আরামসে থাকবেন।

র‍্যাপারটা বেশ করিয়া মুড়ি দিয়া আর একবার মুসাফিরখানাটা দেখিয়া লইলাম। যাত্রীর সংখ্যা বেশী নয়—যাহারা আছে তাহারা হাত পা গুটাইয়া শামুকের মত যেন পিঠে একটা খোলার সন্ধান করিতেছে বলিয়া মনে হইল। কনেস্টবলটা ওভারকোট গায়ে দিয়াও হি হি করিয়া কাঁপিতেছে।

কুলিটা বলিল—কি বাবু চিজ-বিজ এখানে নামিয়ে দেই।

বলিলাম—ধরমশালা আছে বলছিলে না?

—হাঁ—ও তো পহেলাই হামি বল্‌লাম বাবুজী!

—চল বাবা—সেইখানেই চল। কতদূর এখান থেকে?

—ওহি বাবু—বাতী জলছে, খুব কাছেই।

অল্প খানিকটা আসিয়াই ধরমশালা পাইলাম। কুলিটাকে মনে মনে বহু ধন্যবাদ দিলাম—সত্যই বাড়ীখানি শীতের দিনে আরামপ্রদ। ছোট্ট এক টুকরা উঠানকে মধ্যে রাখিয়া চারিপাশে সারি সারি ঘর। ঘরগুলির কোলে আচ্ছাদিত টানা বারান্দা। বারান্দার উপরেই আড্ডা গাড়িয়া বসিলাম। সমস্ত বাড়ীখানাই অন্ধকার। বাড়ীর প্রবেশ মুখেই দরজার মাথায় একটি চৌকা লণ্ঠন জ্বলিতেছে—বহুদিনের অমার্জ্জনায় কালি-পড়া কাচের ভিতর স্তিমিত আলো লালচে হইয়া উঠিয়াছে। বসিয়া ভাবিতেছিলাম—একটা বাতি হইলে হইত।

—বাবুজী!

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, এক প্রৌঢ় বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে নিতান্ত সাধারণ বেহার প্রদেশের অধিবাসী—গায়ের উপরের অংশটা

নগ্ন, পরণে ময়লা কাপড়, লোকটির হাতে একগাছি ঝাঁটা। বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমাকে বলছ ?

লোকটি বলিল—হাঁ, বাবু। বিছাওনা তো বিছাইবেন, ঝাড়ু দিয়ে দিই।

লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলাম—তুমি কে ?

—আপইলোগনকে দাস হামি। ধরমশালাকে নোকর।

এই অসহায় অবস্থায় অকস্মাৎ একজন দাস পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম, বেশ নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলাম—হ্যাঁ হে—এখানে বাতি মোমবাতি মিলবে ?

সে বলিল—হাঁ জরুর মিলবে। আমি নিজে কিনে রেখে দিয়েছি—আপলোকের জন্যে।

মনে মনে ধরমশালার প্রতিষ্ঠাতাকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, সচরাচর এমন বন্দোবস্ত তো দেখা যায় না !

লোকটিই বলিল, বাতি চাই আপনার ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লোকটার দিকে চাহিয়া বলিলাম, চাই বৈকি। বাতি আর কার না দরকার হয়, ওটা তোমার যাত্রী এলে সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া উচিত। সে বলিল, উ তো সচ বাত হ্যায়। লেকিন—যাত্রী লোকই নিতে চায় না হুজুর, বলে বহুত আক্রা—দুনা দাম। তারা আঁধিয়ারমেই দো-চার ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে চলে যায়। দেখিয়ে না—সব আদমী আঁধিয়ারমেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

কথাটা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতেই একবার চারিদিকে

চাহিয়া দেখিলাম। ছাদ ও থামের আওতার মধ্যে দরজার মুখের স্তিমিত আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাই ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও নাসিকাধ্বনির কোরাস শুনিয়া কথা অবিশ্বাস করিলাম না। লোকটী বলিল, বাতি এনে দেব হুজুর ? একটা না দুটো ? ছোট বাতি দুটো না হলে—।

অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, দুটোই নিয়ে এস কত দাম ?

—দু পয়সা হুজুর। বাজারমে পয়সামে দোঠো মিল্‌তা, তা আপনিই বিচার করুন—আমি কিনে রেখে দিই থোড়া মুনাফা না হলে—

—আচ্ছা, আচ্ছা তুমি নিয়ে এস।

একটা বাতি জ্বালতেই স্থানটা মৃদু আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। লোকটি আমার প্রয়োজন মত স্থানটুকু পরিষ্কার করিয়া দিয়া বলিল, বিছাওনা বিছাইয়ে দিই হুজুর ?

বুঝিলাম, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় সে অতিমাত্রায় ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। এই অজানা দেশে রাত্রিকালে তাহার ভক্তিতে আঘাত করিলাম না, মন আমার আমাকেই চুপি চুপি বলিল—নৌকায় নদী পার হইয়া নাবিকের সহিত বোঝা-পড়া করাই ভাল। যুক্তিটা মানিয়া লইলাম। নিজেই বিছানাটার বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিলাম—হ্যাঁ, শোব বৈকি, একটু দাঁড়াও, আমি বিছানাটা খুলে খুচরো জিনিষগুলো বের করে নিই।

আবার একবার স্থানটায় ঝাড়ু বুলাইয়া সযত্নে বিছানা পাতিয়া দিয়া লোকটি বলিল—পানি, জল লাগবে বাবুজী। পথিকের কিসের পর কোন বস্তুর প্রয়োজন লোকটার যেন ধারাপাতের ধারায় মুখস্থ, দুইএর পর

তিন'এর মত। খুসী হইয়া বলিলাম,—হ্যাঁ বাবা, পানি তো চাই—কিন্তু আমার ত' ওই ছোট লোটা, একটু মুখ হাত ধুতাম।

—আমার বালতী লিবেন হুজুর?

পরম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলাম—হ্যাঁ হ্যাঁ—নিয়ে এস।

অল্পক্ষণের মধ্যে সে এক বালতী জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।...

গামছাটা বাহির করিয়া মুখ হাত ধুইতেছি—এমন সময় একদল মাড়োয়ারী যাত্রী আসিয়া হাজির হইল। লটবহর মেয়েছেলে লইয়া দলে তাহারা বেশ ভারী। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেবকটি বারান্দা হইতে ঝাড়ু গাছটি কুড়াইয়া লইয়া তাহাদের কাছে গিয়া হাজির হইল—শেঠজী!

আমি আর ওদিকে কান দিলাম না, আপন পরিচর্য্যায় মনোযোগ দিলাম। মিনিট দুয়েক পরেই মাড়োয়ারী দলের এক ব্যক্তি আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন—আপনার বাতিটা একবার দিবেন মশা? এ দু-মিনট। বলিতে বলিতেই তিনি বাতিটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। অবাক হইয়া আলোক ধারার পশ্চাতে দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, শেঠজীলোক একখানা ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। ঘরের ভিতর ঝাড়ু টানার খস খস শব্দ উঠিতেছে। অন্ধকারের মধ্যেই নীরবে বসিয়া এইবার অকস্মাৎ অনুভব করিলাম—পেট বেশ জ্বলিতেছে—জঠরানল উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

স্টেশন প্লাটফর্ম্ম ভিন্ন খাবার পাওয়া যাইবে না। কিছু পাওয়া গেলেও সে খাওয়া ঠিক নয়—অন্তত সেই প্রতিশ্রুতি দিয়া বাহির হইয়াছি। হঠাৎ বোধ হয় ক্ষুধার জ্বালায় মন শেঠজীলোকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। হাঁকিয়া বলিলাম—বাতি ঠো দিন মশায়।

শেঠজী বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—আর থোড়া সবুর করেন মশা, দো মিনট্।

পরক্ষণেই আবার বলিলেন—আপকে পাশ তো একটা বাতি আছে—উটা জ্বালেন না।

—উঃ, নরক গুলজার যে! কোন এক অপরিচিত কণ্ঠে কথা কয়টি ধরমশালার প্রবেশ মুখেই ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠ অপরিচিত, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পরিচিত—একেবারে খাঁটি বাঙলা। উৎসুক হইয়া সেইদিকে চাহিলাম, লালচে আলোর স্তিমিত প্রভায় বেশ ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও, বুঝিলাম ভদ্রলোক বাঙালী। গায়ে গরম জামাকাপড়গুলি আধুনিক রুচিসম্মত, ভদ্রলোকের হাতে ছোট একটি স্যুটকেস ও বগলে একটি ছোট বিছানা, মুখে প্রজ্বলিত সিগারেটের আগুনের প্রতিবিম্বে দেখিলাম চোখে চশমাও আছে। অকস্মাৎ একটা তীব্র আলোকরশ্মি ধূমকেতুর পুচ্ছের মত জ্বলিয়া সারা বারান্দাময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া আমার মুখের উপর পড়িয়া স্থির হইল। ভদ্রলোক টর্চ্চ জ্বালিয়াছেন। আলোকের তীব্রতায় বিরক্তিভরে চোখ ফিরাইয়া লইলাম, ইচ্ছা হইল বেশ রূঢ় কয়েকটা কথা লোকটাকে শুনাইয়া দিই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—যাকরে বাবা, ভাইয়ের বন্ধু ভাই, কোথায় গেলে পাই? তা' বহু কষ্টেই পেয়েছি আপনাকে। উঃ মশাই, সেই আগ্রা আর এই কিউল—এর মধ্যে গাড়ীতে একজন বাঙালী উঠল আমার ভাগ্যে? যাক, এই পাশেই বসা যাক।

বলিয়া আবার টর্চ্চটা জ্বালিয়া পাশেই বিছানা ও স্যুটকেস রাখিয়া চাপিয়া বসিলেন। আমি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় বাতিটা বাহির করিয়া

জ্বালিয়া ফেলিলাম, শেঠজীকে আর অৰ্দ্ধদগ্ধ বাতিটার জন্য বিরক্ত করিলাম না।

ভদ্রলোক বাতির আলোকে আমার জিনিষ-পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—ও আপনি যে একটা সংসার সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। কতদূর যাবেন ?

হাসিয়া বলিলাম, পাঞ্জাব পর্য্যন্ত। বেড়াতে বেরিয়েছি।

মোটে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ? তার জন্য এত আসবাব ? আমার এই দেখুন, এই এতেই Whole India. তবে আমাদের কথা স্বতন্ত্র—জীবন-বীমার দালাল। বলিয়া তিনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

বাবুজী !

দেখিলাম সেবক-প্রবর আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রলোক বলিলেন—এ চন্দ্রবদনটি আবার কে ? আপনার চেলা নাকি ?

হাসিয়া বলিলাম, না—ও হ'ল আমাদের দাস, ধরমশালার নোকর। সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করিয়া সে বলিল—হাঁ মায়-বাপ আপলোগন্‌কা দাস হামি—ধরমশালাকে নোকর।

ভদ্রলোক বলিলেন—ভালোরে বাপধন দাসজী, এখন কেয়া আরজ তুমহারা ?

লোকটি বলিল, আপলোগন্‌কা হুকুম কিছু যদি থাকে বাবুজী, খানাপিনা ?

তিনি বলিলেন—না বাবা, সহস্র ধন্যবাদ তোমাকে দাস মহাশয়, খাবারের দরকার নেই আমার।

আমার কিন্তু দরকার ছিল, আমি বলিলাম—কি মিলবে এখানে? সেই স্টেশনে যেতে হবে তো ?

—নেহি, মায় বাপ, এই নগিচে আমার একটা খাবারের দোকান আছে ; যা বলবেন, তাজা বানিয়ে দেব—পুরী-তরকারী রাবড়ী—যা আপনার বরাত হবে বলুন।

—তোমার দোকান ?

—হাঁ হুজুর, আমি এখানে নোকরী করি, আমার পরিবার বরাত মত জিনিষ বানিয়ে দেয়। গরীব আদমী হুজুর, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর—কিছু মুনাফা না হলে চলে কি ক'রে? কি আনব বলুন?—খানচারেক পুরী আর—

খপ করিয়া আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—না। পাগল না কি আপনি? একরাত্রি না খেলে মানুষ মরে যায় না। বলিয়া আমার হইয়াই লোকটিকে বলিয়া দিলেন—'নেহি, কুছ দরকার নেহি হ্যায়।'

লোকটি আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির মধ্যে অদ্ভুত এক কাঙালপনা। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া মানুষের করুণা হয়ত খানিকটা হয়, কিন্তু করুণার চেয়ে ঘৃণা হয় বেশী।

—আসুন।

সঙ্গীর কথায় চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, তিনি বিছানার বাঁধন খুলিয়া একটি ছোট টিফিন কেরিয়ার বাহির করিয়াছেন, এবং লুচি, আলু ভাজা বাহির করিয়া দুই ভাগ করিয়া আমাকে বলিতেছেন—আসুন।

অন্তর আমার প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল—এ কথা গোপন করিয়া লাভ নাই। ক্ষুধার অপর নাম জঠরানল, লোভ সেই অনলশিখার কলুষকালি। তবুও মুখে বলিলাম, না না, ওর কাছেই তৈরী করিয়ে নিই।

রাধা দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, হঁ্যা তারপর একটা ব্যাধি-ট্যাধি হোক এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, আমার হাঙ্গামা বাড়ুক—আপনার বাড়ীতে এটা গ্রাম করি, আটকে পড়ে থাকি। আচ্ছা মানুষ মশায় আপনি, ওই নোংরা লোকের হাতে খেতে রুচিও তো হচ্ছে আপনার!

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—না না, তা বলছি না।—না না আর দেবেন না।

ভদ্রলোক আমাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া লোকটিকে বলিলেন—পানি কাঁহা মিলেগা, দেখলাও;

বলিয়া আমার লোটাটা লইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

শস্যকণার মধ্যে যে ধরিত্রী জননীর স্তন্যসুধা সঞ্চিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিতৃপ্ত উদরে বিলাস ভোজনে সে সুধার আস্বাদ সম্যক পাওয়া যায় না—আগুন না জ্বলিলে তাহাতে ঘৃতাহুতিতেও কেবল ধোঁয়াই উঠে! আহার করিয়া এমন তৃপ্তি বহুদিন পাই নাই। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—এমন সময়ে ভদ্রলোক বলিলেন—ও হো-হো, দাঁড়ান, দাঁড়ান! বলিয়া আবার টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া বসিলেন—সর্ব্বশেষ বাটিটা খুলিয়া একটা মিষ্টান্ন আমার পাতে দিয়া বলিলেন—'বলুন দেখি কি জিনিষ এটা?'

নিজেও তিনি একটা পাতায় তুলিয়া লইলেন। মিষ্টান্নটার খানিকটা ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া—যাহাকে বলে বিমোহিত হইয়া গেলাম।

আবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, বলুন তো কি মিষ্টি ?

—বাবুজী !

—কি হে বাপু—আবার তোমার খবর কি ?

—থোড়া রাবড়ী বাবুজী, বানাইয়ে রাখিয়েছিলাম, বরবাদ হ'বে। আপলোক কিরপা করকে যদি ভোজন করেন।

ভদ্রলোক এবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আচ্ছা রাখ। কি দাম লাগবে ?

যো কুছ আপলোগনকে কিরপা হয় হুজুর, আমার তো সবই বরবাদ হো গিয়া।

ঠন করিয়া একটা সিকি অথবা দো-আনি তিনি তাহাকে ফেলিয়া দিলেন। আমি তখন লোটাটা লইয়া ঢক ঢক করিয়া জল গলায় ঢালিতেছি। ভদ্রলোক বলিলেন, একটু খেয়ে দেখুন, বেড়ে বানিয়েছে।

বলিলাম এক ফোঁটাও না, গলায় গলায় হয়েছে আমার।

রাবড়ীর ভাঁড়টা সরাইয়া দিয়া ভদ্রলোক আহার পর্ব্ব শেষ করিলেন। তারপর একটা সিগারেট আমাকে দিয়া নিজে একটা ধরাইয়া বলিলেন, এইবার একটা সিগারেট, তারপর নিদ্রা। ব্যস।

আমি কিন্তু ওই সেবকটির কথা ভাবিতেছি, লোকটার মধ্যে স্বার্থপরতা চমৎকার বঙ্কিমভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। এক পয়সার বাতি দু' পয়সায় বেচিয়া থাকে, রাবড়ী নষ্ট হইলেও নিজে খায় না, কোনরূপে কাহাকেও বেচিয়া মুনাফা অর্জ্জন করে। আরও কি কি করে ওই জানে।

ভদ্রলোক ইহারই মধ্যে চুপ করিলেন যে।

অগত্যা আমিও ঘুমের চেষ্টায় চোখ বুজিলাম।

*　　　*　　　*　　　*

চোখ মেলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা? এ কদর্য্যমূর্ত্তির লোকটি কে?

—বাবুজী।

আবার চোখ বুজিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম কে লোকটা?

—কেমন বোধ করছেন এখন?

চোখ খুলিয়া দেখিলাম একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়াইয়া ঐ প্রশ্ন করিতেছেন। প্রত্যুত্তরে আমি প্রশ্ন করিলাম—এ আমি কোথায়?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, কিউলের ধরমশালায়। আপনার কিছু মনে পড়ছে না?

আবার একবার সমস্ত স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম।

ভদ্রলোক বলিলেন, জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেন আপনি, খাবারের সঙ্গে আপনাকে কেউ বিষ দিয়েছিল। ধন্যবাদ দিন এই লোকটিকে—এই আপনার জীবন রক্ষা করেছে। তাড়াতাড়ি আমাকে ডেকে এনেছিল, এবং সময়ে ডেকে এনেছিল বলেই এত শীগ্‌গির আপনার জ্ঞান হয়েছে।

এইবার সব মনে পড়িল। প্রশ্ন করিলাম—আপনি ডাক্তার?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ীতে একটা—

—হ্যাঁ, টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

—আমার জিনিষপত্র ?

—সব ঠিক হ্যায় বাবুজী! একদম পহেলেই আমার মালুম হয়ে যেতেই লোকটা ঝটসানি ভাগ গেল। আঁধিরায় রাত বাবুজী—দুসরা আদমী কোই ছিল না হামি আপনাকে দেখবে—না—উসকে পাকড়াবে!

আমি জামার বুকে হাত দিলাম। গায়ে জামা ছিল না—ছিল গেঞ্জী। বলিলাম, আমার মনিব্যাগ ?

লোকটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—হামার পাসে আছে বাবুজী, আনিয়ে দিই।

* * * *

আশ্চর্য—একটি পয়সা কম পড়িল না। প্রশ্ন করিলাম, টেলিগ্রাম করা হয়েছে বলছিলেন না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, আপনার কাগজপত্র দেখে আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করেছি—এক টাকা বার আনা লেগেছে।

লোকটি বলিল—হুজুর—উ হাম আপসে দিয়া হ্যায়। টেলিগিরাপ এক রূপেয়া বার আনা—দাওয়াই লিয়া তিন রূপেয়া—বরফ চৌদাআনা—ডাগদারবাবুকে লিয়ে পান এক পয়সা, সিগারেট দুঠো তিন পয়সা বাতী আর দুঠো দো পয়সা, হুয়া আপকে। মনে মনে সে বোধ হয় হিসাব জুড়িতে আরম্ভ করিল।

এই সময়েই আমার আত্মীয়স্বজন ধরমশালায় প্রবেশ করিলেন। আবেগের প্রথম আতিশয্য কাটিয়া গেলে সকলে একটু শান্ত হইয়াছেন, এমন সময় সেই লোকটি আসিয়া সবিনয়ে বলিল—জানানা লোকের জন্যে

তুসরা কামরা সাফা করে দিয়েছি—পানি ভি আনিয়েছি। আউর হুকুম হোয় তো—খাবার পুরী তরকারী—

স্ত্রী আমাকে প্রশ্ন করিলেন—ও লোকটা আবার কে ?

সে সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—আপলোগন্‌কা দাস হামি মায়ীজী, ধরমশালার নোকর হামি।

ফ

অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কাত্তিকবাবু বলিলেন, সাহেবদের তাড়িয়ে কি রাজত্ব করবে তোমরা? ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি করা তোমাদের স্বভাব!

অতঃপর তিনি যাহা বলিলেন সেটুকু চর্ব্বিত চর্ব্বণের সামিল; বহুবার তিনি একথা বলিয়াছেন। সুতরাং তরুণের দল মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিল। কাত্তিকবাবু এটুকু লক্ষ্য করিলেন; তিনি তীক্ষ্ণ ঘৃণার সহিত বলিলেন—হেসো না, হাসির কথা নয়! ইংরেজরা আমাদের ভাই, এক বংশ। ওরা আর্য্য আমরাও আর্য্য। আমরা বাবাকে প্রাচীন ভাষায় বলি, পিতা—পিতর, ওরা বলে ফাদার, মাতা—মাদার, বাবা পাপা, মা মামা, ভ্রাতা ব্রাদার! তফাৎ কোনখানে? আমরা ভয় লাগলে বলি, হরিবোল হরিবোল, ওরা বলে 'হরিবল্ হরিবল্'। চামড়ার তফাৎ—সে তোমার দেশের জলবাতাসের গুণে। আমাদেব বৈষ্ণবধর্ম্মে বলেছে, তৃণাদপি সুনীচেন—তৃণের চেয়ে নত হবে। তা না ধ্বজা পতাকা উঁচু করে বন্দেমাতরম্ আর ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা।

ছেলেরা কি একটা ডে উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল তাহারা আর তর্ক না করিয়া পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। কার্ত্তিকবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ যাও, বাড়ী যাও সব। পড়াশুনো কর মন দিয়ে, চাকরীবাকরী কর।

কিন্তু ছেলের দল গান ধরিল—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—কার্ত্তিকবাবু তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—An idle brain is the devil's workshop! বেকার—যত সব অপগণ্ডের দল!

সত্যকার গোপন কথাটী হইতেছে পেন্সন। কার্ত্তিকবাবু বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন, এখনও মোটা পেন্সন পাইয়া থাকেন! সংসারের কয়েকজন এখনও সরকারী কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রাচীন জমিদার বংশের ভূতপূর্ব্ব নায়েব প্রৌঢ় রামসুন্দর বলিল, সর্ব্বদেবময়ো রাজা! এখনও আপনার এক দুই তিন বললে লাট নিলেম হয়; কিন্তু দরখাস্ত কর, নীলেম করাবো না। ব্যবস্থা কি! বন্দোবস্ত কি!

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, তোমার বাবুর ছোট ছেলেটি আবার এককাঠি সরেশ। সে আবার কি বলে কংগ্রেসের Leader, একেবারে extremist. উগ্রপন্থী! বাপরে!

রামসুন্দর অপেক্ষা করিয়া বলিল, আর বলেন কেন মশাই, সে আবার বলে ঈশ্বর মানি না।

—তোমার বাবুকে ছেলের বিয়ে দিতে বল, ছেলের বিয়ে দিন।

—বিয়ে করে খাওয়াবে কি বলুন, ছেলেপিলে হবে তাদের ভরণ-পোষণ করবে কি দিয়ে। সেই জন্যেই তো আপনাকে বারবার বিরক্ত করছি।

জমিদারবাবু রামসুন্দর মারফৎ ছেলের চাকরীর জন্য কার্ত্তিকবাবুকে ধরিয়াছেন।

কার্ত্তিকবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বড় দুঃখ হয়, বুঝলে রামসুন্দর, এতবড় বংশের এই রকম পরিণাম দেখলে বড় দুঃখ হয়! বিশেষ ক'রে আমাদের দুঃখ হয় বেশী।

রামসুন্দরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, তা তো হবারই কথা, আপনারা হলেন আত্মীয়—আপনার জন, দশজন পরের হয়, তো আপনাদের কথা তো স্বতন্ত্র।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, যা হয়েছিল তা হয়েছিল, দৈবের উপর হাত ছিল না, কিন্তু কর্ত্তার মাথাটা যদি খারাপ না হত তা হলে বাড়ীটা বজায় থাকত। ধীরেনের কাণ্ডটি থেকেই ওঁকে সেরে দিয়ে গেল।

রামসুন্দর এ তথ্যটা অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মশাই, মাথার ওঁর অনেকদিন থেকেই গোলমাল হয়েছে। বুঝলেন, বহুদিন পূর্ব্বে প্রথম সংসার শেষ হবার পরই এর সূত্রপাত। তখন মধ্যেমধ্যে কবরেজ ডাকিয়ে ফিস্‌ফাস্ ক'রে পরামর্শ করতেন। একদিন কবরেজ আমাকে বলেছিলেন, বড়লোকের কেমন অদ্ভুত ভয় দেখ দেখি। বলেন কি—দেখ আমার হাতে কুষ্ঠ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেন? না—হাত কিরকম লাল হয়েছে দেখ।

কার্ত্তিকবাবু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি? কুষ্ঠ?

—আরে মশাই কুষ্ঠ কোথায় পাবেন, মনের ভয়। আমার মনে হয় ঐটাই মাথাখারাপের সূত্রপাত। হাতের তালু অল্প অল্প লাল সকলেরই

হয়—আবার ওঁদের বংশের কথা আলাদা—ওঁদের হাতেই যেন লাল রঙ মাখানো। এখন আর তাও নাই—রক্তহীন সাদা ফ্যাকাসে চেহারা হয়ে গেছে বাবুর।

কার্ত্তিকবাবুর কিন্তু কথাটায় বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে মনেই কথাটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। রামসুন্দর কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, এখনও তো আপনার সেই একই বাতিক—ধীরেনবাবুর দ্বীপান্তর হবার পর থেকে বাতিক—বাঁ হাতে আমার কুষ্ঠ হচ্ছে। তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না—আমি বেশ বুঝতে পারি। আগে চুপচাপ থাকতেন, যা বলা কওয়া কবরেজের সঙ্গেই হত। এখন সেটা প্রকাশ্যে—আর ওই একটা মনগড়া লজ্জায় ঘর থেকে বেরুবেনও না, কিছু করবেন না হাত দিয়ে, চুপচাপ ঘরে বসে আছেন।

ধীরেন জমিদার মহাবিষ্ণু সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছয় বৎসর পূর্ব্বে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, দেখ রামসুন্দর, বলতেও আমার বাধে—লজ্জা কষ্ট দুইই হয়। ওঁরা হয়ত মনে করবেন কার্ত্তিক কাজ করে দিলে না। কিন্তু যার বাপ পাগল, ভাই খুন করে দ্বীপান্তরবাসী, নিজে যে সরকারের বিরোধী, তার চাকরী কি হয়। অন্ততঃ সরকারী চাকরী।

রামসুন্দর সরকার বাড়ীর পুরাতন নায়েব। বর্ত্তমানে সরকার বংশের সম্পত্তিও নাই, রামসুন্দর আর নায়েবও নয়, তবুও মমতার একটা নিবিড় বন্ধনে পুরাতন প্রভুবংশের সহিত তাহার জীবন জড়াইয়া গিয়াছে। সে এখনও তাঁহাদের জন্য এই সংসার সমুদ্রে ভারবহনক্ষম

একখানি তরণীর সন্ধানে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তরণীতে তাহার মন উঠে না; মনের গোপন ইচ্ছা—একখানি ধ্বজশোভিত অর্ণবপোত। এই চাকরীর জন্য কার্ত্তিকবাবুকে অনুরোধ সে মিথ্যা মহাবিষ্ণুবাবু ও তাঁহার পত্নীর নাম দিয়া, নিজেই করিতে আসিয়াছে। তাঁহারা কেহ বিন্দু-বিসর্গ পর্য্যন্ত জানেন না। দয়াময়ী, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রতিমার মত, ছোটমায়ের ম্লান মুখ মনে হইলে তাহার চোখে জল আসে।

*　　　*　　　*　　　*

পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে রচিত সরকারদের দালান বাড়ীখানা এখন ইটকাঠের একটা স্তূপ, একদিকে একটা বটগাছ প্রবল বিক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই নাগপাশের মত মূলবেষ্টনীর পেষণে একে একে বক্ষপঞ্জরগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। সেদিকটা এখন অব্যবহার্য্য, বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া নিশীথরাত্রে বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে, মধ্যে মধ্যে ধুপধাপ করিয়া পলেস্তারা বা ইটের চাঙর খসিয়া পড়ে; দুইমাস তিনমাস অন্তর এক একখানা কড়ি অথবা বরগা। একটা অংশ জরাজীর্ণ হইলেও এখনও ব্যবহার করা চলে, সেই অংশে মহাবিষ্ণুবাবু তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্র নীরেনকে লইয়া বাস করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর সন্তান সন্ততি ছিল না, কনিষ্ঠা পত্নী করুণাময়ীর দুই পুত্র ধীরেন ও নীরেন। আশ্চর্য্য দুইজনে প্রকৃতিতে দিন ও রাত্রির রূপের মত বিরোধী এবং বিপরীত। ধীরেন এই জমিদারবংশের বংশানুক্রমিক ধারায় দুর্দ্দান্ত, দাম্ভিক, উগ্র, বিলাসী—জীবনে সে চলিতে চাহিত ঝড়ের মত, তাহার সম্মুখে নত না হইলে সে তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া

যাইতে চাহিত। লেখাপড়াও বিশেষ করে নাই, স্কুল হইতেই বিদায় লইয়া সে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছিল। প্রয়োজনও ছিল। তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই মহাবিষ্ণুবাবু ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া-ছিলেন—মধ্যে মধ্যে কবিরাজ আসা-যাওয়া করিত অপর কাহারও সহিত দেখা করিতেন না—বাহিরেও বড় আসিতেন না। ধীরেনের মাও বিশেষ আপত্তি করিলেন না—এতবড় বাড়ীর পৈতৃক মর্য্যাদাসম্পদ উদ্ধার করিতে যদি ধীরেন পারে—তবে ঊর্দ্ধতন সাতপুরুষ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সেই ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল। তরুণ ধীরেন্দ্র মহলে গিয়াছিল—সেখানে প্রজাদের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া বসিল। একদিন প্রজাদের কয়েকজন মাতব্বর আসিয়া তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলিল, আপনি এমন করে চাপরাশী লগ্দী পাঠাবেন না বাবু, আমরা আর খাতির রাখব না।

ধীরেনের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ অজগরের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, হুঁ। তারপর ?

—আমরা খাজনাও দেব না। বৃদ্ধি সুদ এতো দেবই না ?

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? বেশী যদি করেন—আমরা মেজেষ্টারের কাছে দরখাস্ত করব—দরবার করব।

—আর ?

আর কিছু প্রজারা খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু একটী উনিশ কুড়ি বৎসরের ছেলের এই আকাশস্পর্শী আভিজাত্যের নিকট অত্যন্ত খাটো

হইয়া গিয়া তাহাদের অন্তর ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। সেই ক্ষোভের আক্রোশেই একজন বলিয়া উঠিল, মশায়, এত ভাল নয়, বুঝলেন। এই পাপেই আপনার বাবার কুষ্ঠ হয়েছে! অকস্মাৎ যেন একটা বজ্রপাতে আগ্নেয়গিরির উৎসমুখ খুলিয়া গিয়া অগ্ন্যুদ্গার হইয়া গেল। হাতের কাছেই ছিল বন্দুক—একটা বিপুল শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল, লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রোতে মাটী ভাসিয়া গেল। ধীরেন্দ্র বন্দুকটা খুলিয়া ফুঁ দিয়া নলের ধোঁয়া বাহির করিয়া দিয়া বন্দুকটা হাতেই থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করিল। কোন কথা সে গোপন করিল না। অনুগ্রহ করিয়া বিচারক চরম শাস্তির পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে আদেশ দিলেন। সে আজ ছয় বৎসর পার হইয়া গেল।

এখন এ সংসারের ভরসাস্থল নীরেন। ভরসা করিবার মত সন্তান সে। ধীরেন্দ্রের মামলায় ও ঋণের দায়ে বিষয় সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া গেল, নীরেনের স্কুলের বেতন যোগান দায় হইয়া উঠিল। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টার তাহার বেতন কোনদিন চাহিলেন না। ফ্রি-স্টুডেণ্ট-শিপও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, তবু তাহার বেতন মাসে মাসে জমা হইয়া যাইত। নীরেনকে ডাকিয়া মাস্টার মশায় বলিয়া দিলেন, দেখ, যখন তোর হবে মাইনে দিস, আমরা বাকীই রেখে যাচ্ছি। বেতন লাগবেনা কথাটাও তিনি বলেন নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় রামসুন্দর একেবারে হিসাব করিয়া টাকা আনিয়া দিল। বিনাপ্রশ্নে মাস্টারমহাশয় সে টাকা গ্রহণ করিলেন। নীরেন বৃত্তি পাইল পনের টাকা। মাস্টারমহাশয় নতুন ঝকঝকে বই নীরেনকে পাঠাইয়া দিলেন—

To the best boy of my school—with my best wishes.

তারপর নীরেন আই-এ, বি-এও সম্মানের সহিত পাশ করিল। কিন্তু এম-এ পরীক্ষা দিবার সময় জাতীয় আন্দোলনে মাতিয়া পড়া ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

তাহার মা বলিলেন, নীরেন, বাবা আমার মাথা আর খাস্‌নে বাবা!

মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরেন বলিল—তোমার মাথা কি আমি খেতে পারি মা?

মা ভুলিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন, মায়ের চোখের জল ফেলিয়ে কি আনন্দ হয় নীরু?

—আনন্দ? জান মা, আলেকজেণ্ডার বলেছিলেন—আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল—

—মিথ্যে আমায় ভোলাচ্ছিস নীরু, তুই আমায় পরিষ্কার কথা বল; যা বুঝতে পারি এমন কথা বল।

—তোমাকে দুঃখ আমি দিতে পারি না মা। আমায় কি করতে হবে বল?

—উপায়ের একটা পথ কর; এম-এ টা পাশ কর—আইন পড়। বাবুর বড় সাধ ছিল ধীরেনকে উকিল করবেন—আর—

ঝরঝর করিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নীরেন সেই বৎসরেই এম-এ পরীক্ষা দিয়া বসিল। পড়াশুনা তাহার শেষ হইয়াই ছিল, পরীক্ষায় পাশও সে করিল। কিন্তু ফল আশানুরূপ হইল না। রামসুন্দর আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল—এইবার ভাই

আইন পাশ করে ফেল। আমি তোমাকে কেশ এনে দেব। একবার ওই কার্ত্তিকবাবুকে আমি দেখিয়ে দিই তা হ'লে।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

অন্ধকার রাত্রি। বাড়ীর সেই ফাটলেভরা জরাজীর্ণ অংশটার ছাদের উপর নীরেন বসিয়াছিল। মৃদু বাতাসের বেগে বটগাছটার পত্রান্দোলনে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছিল—যেন কাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, কানাকানি করিয়া হাসিতেছে। নীরেন সেই দিকে চাহিয়া কিছু বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল। মা তাহার সন্ধান পাইলেন, তিনি ডাকিলেন—নীরেন উঠে আয়!

নীরেন হাসিয়া বলিল—তুমি বুঝি আমার গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াও? সন্ধানও ত ঠিক পাও।

—উঠে আয় আগে।

নীরেন অবহেলা করিল না, উঠিয়া সন্তর্পণে ভাঙ্গা ছাদ পার হইয়া নিকটে আসিতে মা বলিলেন—তুই কি আমার সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বি নে? ওই ভাঙ্গা ছাদ—চারিদিকে ফাটল গর্ত্ত—ওই বটগাছ—ওখানে তোর কি কাজ শুনি?

নীরেন হাসিয়া বলিল—বেশ লাগে মা আমার।

—তুই আর হাসিসনে নীরেন, তোর হাসি দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কখনও কি তোর মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তা হয় না, দুঃখ হয় না! এই এত বড় বংশ, এত বড় বাড়ী—কি ছিল মনে কর দেখি—আর ভাব তো কি হয়েছে!

সেই হাসি হাসিয়াই নীরেন বলিল—সেই ত ভাবি মা। ভাবি কেন,

চোখে যেন দেখি—'মা কি হইয়াছেন।' আনন্দমঠ মনে আছে মা-? মা কি ছিলেন—আর মা কি হইয়াছেন! অন্ধকার কালো রাত্রির মধ্যে—আমাদের এই ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে—সমস্ত দেশের—

মা বলিয়া উঠিলেন—তোর পায়ে পড়ি নীরেন—চুপ কর! তোর দেশকে ছাড়। মাটিকে ভক্তি না করে মাকে ভক্তি কর একটু!

মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া নীরেন বলিল—তুমি বড্ড সেন্টিমেণ্টাল। আর রাগ করবে না তো, বড্ড হিংসুটে তুমি।

মা দৃঢ়স্বরে এইবার বলিলেন—দাঁড়া এইবার তোর বিয়ে দেব আমি। তোর এই সব পাকামী আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

নীরেন হা হা করিয়া হাসিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাসি দেখিয়া মায়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—হাসছিস কেন?

—বিয়ের কথা শুনে আনন্দ হচ্ছে মা।

মা আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি সেখান হইতে একেবারে আসিয়া সন্তর্পণে স্বামীর কক্ষের দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন। পিলসুজের উপর প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। ঘরখানি আয়তনে বৃহৎ, ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের মৃদু আলোকের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে পারে নাই, আলোকিত পরিধিটুকুর চারিপাশে অন্ধকার নিথর হইয়া যেন দীপ নির্ব্বাণের প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর ঘরখানা অস্বাভাবিক রূপ নিস্তব্ধ। আলো-আঁধারির নিস্তব্ধতায় ঘরখানি যেন রহস্যের মোহে আচ্ছন্ন। মহাবিষ্ণুবাবু বিছানার উপর নিস্তব্ধ ছায়ামূর্ত্তির মত বসিয়া আপনার বাঁ হাতখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিলেন।

নীরেনের মা ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি নীরবে তাঁহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ওই দৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ভীষা প্রকাশ পায়। নীরেনের মা তাঁহার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, ক্ষিদে পেয়েছে?

আপনার চিবুকে অত্যন্ত চিন্তিতভাবে একবার হাত বুলাইয়া তিনি মৃদুস্বরেই উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

—আচ্ছা আনছি খাবার। কিন্তু আমি একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। আর না বললে নয়।

—বল।

—তুমি একবার নীরেনকে ডেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল।

—বলব।

—হ্যাঁ। ডেকে বল, বাবা তোর মুখ চেয়ে আমরা বসে রয়েছি। আইন পাশ করে তুই ওকালতি কর—অভাবের কষ্ট আর আমরা সহ্য করতে পারছি না, পৈত্রিক মর্য্যাদা তুই আবার বজায় কর।

—নীরেন এবার ত এম-এ পাশ করলে, না?

—হ্যাঁ। ও যদি মনে করে তবে না পারে এমন কাজই নেই। কিন্তু দেশই ওকে খেলে। কি যে দেশ দেশ বাতিক হয়েছে!

—দেশ?

—হ্যাঁ দেশ—জন্মভূমি—বন্দেমাতরম্!

—হুঁ। তারপর গভীর চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—আচ্ছা, স্বরেন্দ্র বাড়ুজ্জে মশায় এখন কি করছেন?......ও—না, এখন তো লীডার হলেন গান্ধী। বলিয়া তিনি ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিলেন—যেন ব্যাপারটা সব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে—সকল কথাই তাঁহার মনে পড়িয়াছে।

—আমি ডেকে দিচ্ছি নীরেনকে। বলিয়া নীরেনের মা বাহির হইবার জন্য দরজার মুখে ফিরিলেন। মহাবিষ্ণু বলিলেন—শোন!

—কি ?

—অভাব কি আজকাল খুব বেশী হয়েছে ?

—না না ? কিন্তু নীরেন ওকালতি করলে যে আবার সেই সব হবে। চণ্ডীমণ্ডপ, পূজো, বাড়ী, জমিদারী এ সব ফিরে আসবে।

গাঢ়স্বরে মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন—দেখ, কি করব আমি! লজ্জায় বেরুতে পারি না। কুষ্ঠরোগ নিয়ে কি দশের সামনে বার হওয়া যায় ?

—কোথায় তোমার কুষ্ঠ রোগ ? ওই তোমার এক বাতিক! ডাক্তার কবরেজরা কি বলেছে ? দুবার রক্ত পরীক্ষা করান হ'ল, বলেছে কেউ যে ওই ব্যাধি হয়েছে!

—এই হাতটায়। এটাতে আর কিছু নেই। এইটায় দেখ না, এই রকম লাল হয় কারও হাত ? এত টাটিয়ে থাকে। তিনি শীর্ণ জীর্ণ হাতখানি সেই অস্পষ্ট আলোকের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

নীরেনের মা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আর এখন নীরেনকে পাঠাইয়া কোন লাভ নাই—এখন ওই রোগের কথা ছাড়া আর কোন কথাই মহাবিষ্ণুবাবু বলিবেন না। নীরেন ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, মাকে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল—বাবার খাওয়া হয়ে গেল মা ?

মা বলিলেন—না। তুই কাল সকালে একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করবি। আমায় বলছিলেন।

—আচ্ছা।

তারপর আবার সে বলিল—কাল কলকাতায় যাব মা। আইনটা পড়ে ফেলাই ভাল; একটা চাকরী বাকরী দেখে খরচ চালিয়ে নেব কোন রকম করে।

মা খুসী হইয়া উঠিলেন।

নীরেন বলিল, রামসুন্দর দাদার কাছে গিয়েছিলাম আমি। তিনি বললেন, কোন মোড়লের কাছে ষাট টাকা আমাদের পাওনা রয়েছে, কালই তিনি টাকাটা আদায় করে আনবেন। না হ'লে উনিই দেবেন তারপর আদায় করে নিজে নেবেন।

মা সজল নেত্রে বলিলেন, দেখ বাবা, ঐ রামসুন্দরের অনুগ্রহও আমাদের নিতে হচ্ছে। এ লজ্জার হাত থেকে তুই আমাদের বাঁচা। তোদের পৈত্রিক মর্য্যাদা তুই আবার উদ্ধার কর বাবা!

পরদিনই নীরেন কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

* * * *

মাস ছয়েক পর।

গভীর রাত্রে নীরেনের ডাক শুনিয়া মা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

নীরেন? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, না তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

—মা!

ওই তো! নীরেনই তো! তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

—এমন হঠাৎ যে তুই নীরেন? এখন ট্রেণই বা কোথায়?

হাসিয়া নীরেন বলিল, হরিপুরের একটি ছেলে সঙ্গে ছিল মা। সে

একা বাড়ী যেতে পারলে না, তাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী আসছি। নেমেছি রাত্রি আটটায়।

—কিন্তু কই বাড়ী আসবার কথা তো লিখিস নি?

—তোমার জন্যে মন কেমন ক'রে উঠল মা। চলে এলাম।

—মুখ হাত ধুয়ে ফেল, ব'স, আমি দুটো গরম ভাত চড়িয়ে দিই।

—ভাত? একটুখানি চিন্তা করিয়া নীরেন বলিল—আচ্ছা, দাও, অনেকদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি। আবার চলে গিয়ে কবে আসব! কালই চলে যাব।

মা তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দিলেন।

—হ্যাঁরে, দুটো ভাজাভুজি করে দিই কেবল—না, তরকারীও একটা করে দেব? নীরেন!

নীরেন তখন দাওয়ার উপর পড়িয়াই অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মা একটু স্নেহের হাসি হাসিলেন, এখনও সেই বালকের মত স্বভাবই রহিয়া গেল, মাটি বিছানা বিচার নাই, মায়ের উচ্ছিষ্ট এখনও কাড়িয়া খায়! ওযে কেমন করিয়া বিদেশে থাকে?

—দরজা খোল, কে আছে?

কে? কাহার কণ্ঠস্বর? দরজায় এমন ক্রুদ্ধ আস্ফালন ও প্রভুত্বের ভঙ্গিতে কে আঘাত করিতেছে!

দরজা খোল।

নীরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি চল্লাম মা!

—সে কি? তোর হাতে ও কি?

—পিস্তল!

—পিস্তল! নীরেনের মা ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াই যেন পিস্তলটা চাপিয়া ধরিলেন। ছাড়—ছাড়।

নীরেন পিস্তল ছাড়িয়া দিল। সেটা তৎক্ষণাৎ তিনি উঠানের কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, নীরেন!

নীরেন বলিল—আমি একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি ক'রে মেরেছি মা।

মা এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীরেন বলিল, থাকতে পারলাম না মা। অন্য বন্ধুরা আমাকে ভার দিতে চায় নি। আমি নিজেই নিয়েছি, আমি যেন পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য্য তোমার মুখও তখন মনে পড়ল না। ওদিকে দরজার খিলটা প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া গেল। পুলিশ কর্ম্মচারী ও কনস্টেবলে বাড়ীর পাশটা গিস্ গিস্ করিতেছিল।

মায়ের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া নীরেন অগ্রসর হইয়া বলিল, আমি ধরা দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ রাত্রির মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তস্বর জ্যা-বিমুক্ত শরের মতই ঊর্দ্ধলোকের দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আর্ত্তনাদ করিয়া নীরেনের মা সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

*　　　*　　　*

রামসুন্দর আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া নীরেনের মামলার তদ্বির তদারকের জন্য কলিকাতা ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

মহাবিষ্ণু বাবুও ব্যাপারটা শুনিয়াছেন। সেই দিনেই তিনি জানিতে

পারিয়াছিলেন। খানাতল্লাসী করিতে পুলিশ তাঁহার ঘরেও প্রবেশ করিয়াছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন—খুন করেছে নীরেন? অ! তা আমাকে সুদ্ধ ফাঁসী দেবে নাকি?

সেদিন রামসুন্দর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, আপনাকে একবার যেতে হবে। কোর্টে আপনাকে একবার দাঁড়াতে হবে।

—আমাকে? কেন, আমারও বিচার হ'বে নাকি?

—না। সরকারী উকিল আমাদের থানার দারোগার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন আসামীর দাদাও খুন করেছে। আমাদের ব্যারিষ্টার সেই সুযোগে জেরা করেছেন—আসামীর বাপ পাগল কি না? দারোগা স্বীকার করেছে। কিন্তু নীরেনের জন্মের আগে থেকে পাগল। এইটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে!

মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন, কিন্তু কুষ্ঠ রোগ—তা অনেকটা ভাল এখন বটে, কিন্তু তবু তো কুষ্ঠ রোগ!.........

নীরেনের মা বলিলেন, না বাবা রামসুন্দর, ওঁকে আর টানাটানি ক'রনা। হয়ত হঠাৎ হার্টফেল হয়ে মারাই যাবেন। বরং গ্রামের কাউকে.........।

রামসুন্দর বলিল, কার্ত্তিকবাবু যদি সাক্ষী দেন তা হ'লে কিন্তু অনেক কাজ হয়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরেনের মা বলিলেন, আমাদের কবরেজ মশাইকে দিয়ে হবে না? উনি তো সকলের চেয়ে ভাল জানেন।

—দেখি তাই না হয়, মন্দের ভালোও তো হবে। ক্ষুণ্ণ মনেই রামসুন্দর ফিরিল। মহাবিষ্ণুবাবু কি যেন ভাবিতে ছিলেন, অকস্মাৎ বলিলেন, আচ্ছা রামসুন্দর!

রামসুন্দর দাঁড়াইল, বলিল, আজ্ঞে!

—আচ্ছা ওরা আমাকে কেন ফাঁসী দিক না! আমারই তো ছেলে দোষ তো আমারই।

নীরবে মাথা নত করিয়া রামসুন্দর চলিয়া গেল। চোখে জল মুখে হাসি লইয়া নীরেনের মা বলিলেন, ভেবোনা তুমি, রামসুন্দর বলেছে আমাকে—নীরেন খালাস হয়ে যাবে। কবরেজকে দিয়ে এইটে প্রমাণ করাতে পারলেই পাগল বলে খালাস দেবে।

—খালাস দেবে?

—হ্যাঁ দেবে।

—কবরেজকে একবার ডাকাও দেখি।

—ডাকতে হবে না, রামসুন্দর নিজে গেল তার কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

—না, সেজন্যে নয়, ব্যারামটা আমার বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে—মানে এই হাতটা কেবল একবার ভাল করে দেখুন। তুমিই দেখনা, গাঁটে ঘা হয়েছে না? এইবার বোধ হয় গলবে।

নীরেনের মা দেখিলেন—আঙ্গুলের গিঁঠে গিঁঠে কয়টা ক্ষত চিহ্ন। নখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া গিঁঠগুলি ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি কহিলেন, এমন ক'রে নখ দিয়ে ছিঁড়ো না। এ যে সব নখের আঁচড়ের ঘা। ব'স তোমার নখগুলো কেটে দিই আমি। ছোট একখানি কাঁচি লইয়া তিনি

স্বামীর নখ কাটিতে বসিলেন। তাঁহার মরিবার উপায় নাই, তাঁহার কাঁদিবার উপায় নাই, মহাবিষ্ণুবাবু যেন অহরহ তাঁহাকে ডাকেন—দেখ। আমার আঙ্গুলগুলো দেখ তো ভাল ক'রে। না—না এই হাতে কি খাওয়া যায়! তুমি বরং খাইয়ে দাও।

* * * * *

কয়েক মাস পর।

আগামী প্রত্যূষে নীরেনের ফাঁসী হইবে। নীরেনের মা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃদুগুঞ্জনে কাঁদিতেছিলেন। মহাবিষ্ণুবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, তেমনি দৃষ্টি তেমনি ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে তেমনি স্বল্প আলোক—আলোক পরিধির চারিপাশে তেমনি নিথর অন্ধকার।

সহসা মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, রামসুন্দর গেছে কলকাতায়?

—হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যে নাগাদ নীরেনকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। বহুকষ্টেই নীরেনের মা উত্তর দিলেন। সংবাদটা মহাবিষ্ণুবাবুর নিকট গোপন রাখা হইয়াছে।

মহাবিষ্ণুবাবু অত্যন্ত বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তার ফাঁসী হবে আজ; আমি জানি, শুনেছি আমি। তোমরা কথা কইছিলে—

এতক্ষণে নীরেনের মা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহাবিষ্ণু বাবু কিন্তু তেমনি ভঙ্গিতেই বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ কাঁদিয়া নীরেনের মা বলিলেন, আমার ভাগ্যের দোষ, আমার গর্ভের দোষ, আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট!

পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া মহাবিষ্ণু বলিলেন—না! তারপর বহুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, জান না তুমি—কেউ জানে না, শুধু

ভগবান জানেন আমার দোষ, আমার রক্তের দোষ! ছায়ামূর্ত্তির মত মৃদু সঞ্চালনে হাত তুলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে তোমার দিদিকে আমি এই দুই হাতে গলা টিপে মেরেছিলাম।

নীরেনের মা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার নিজের চরিত্র খারাপ ছিল, তাকেও আমার সন্দেহ হ'ত। খুব সুন্দরী ছিল কিনা! আর খুব হাসতো।

নীরেনের মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন. না—না বলতে হবে না! বলে না!

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার অকস্মাৎ মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, যখন তার বুকে চেপে ব'সলাম সে শাপ দিলে, ওই দুই হাতে তোমার কুষ্ঠ হবে। কিন্তু এ হাতটা বাঁচিয়ে দেবে ধীরেন আর ঐটা নীরেন। তোমার দোষ নাই 'খুনে'র রক্ত তো!

বাহিরে পাখীরা কলরবে প্রত্যুষ ঘোষণা করিয়া উঠিল। নীরেনের মা বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, নীরেন নীরেন রে!

চকিত হইয়া মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, এ্যা।

তারপর বলিলেন, ভোর হয়ে গেল?

জানালাটা খুলিয়া দিয়া ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত লক্ষ লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া উদয়াচল হইতে ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সহসা আপনার হাত দুইটি সেই আলোকের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন, সাদা হয়ে গেছে

অস্থি-চর্ম্ম-সার রক্তহীন বিবর্ণ হাত—

তপোভঙ্গ

রাণুর বিবাহ।

নিতান্ত মধ্যবর্ত্তী ঘরের কন্যার বিবাহ, খরচের অঙ্কও এ বাজারের তুলনায় অত্যন্ত অল্পই বলিতে হইবে, তবুও মেয়েদের সাধ হইল 'রৌশন চৌকী' বাজনা চাই।

অল্পবয়স্কা নাতনী, নাতবৌয়ের দল গিয়া ধরিল ঠাকুমাকে—'বাজনা একটা করতেই হবে ঠাক্‌মা।'

ঠাকুমা বলিলেন—'বাজনা ?'

—'হ্যাঁ ঠাক্‌মা! নইলে বিয়ে জমছে না। শাঁক বাজিয়ে উলু দিয়ে আমরা আর পারছি না।'

—'তাই ত রে, আমি বলব কি করে ভোলানাথকে! সে মনে করবে কি! নইলে—'

তিনি চুপ করিলেন, কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, 'বাজনা একটা না হলে সত্যিই মানায় না।'

সমস্বরে এক সঙ্গে চার-পাঁচজন কলরব করিয়া বলিয়া উঠিল—'সেই ত বলছি ঠাক্‌মা, আপনি মনে করলেই হবে।"

ঠাকুমা বলিলেন—'আমারও কিন্তু—'

তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

তারপর আবার বলিলেন—'আচ্ছা, বলছি আমি ভোলানাথকে।'

ভোলানাথ শুনিয়া বলিলেন—"না মা, আবার দশ-বার টাকা অনর্থক খরচ হয়ে যাবে।'

মা বলিলেন—'মেয়েরা কিন্তু বড্ড ধরেছে; ওরা বলছে বাজনা না হলে বিয়ে জমছে না।'

ভোলানাথবাবু হাসিয়া বলিলেন—'বল কি, এত চীৎকারেও বিয়ে জমছে না! চীৎকারে বাড়ীখানা প্রায় ফাট ধরল!'

মা বলিলেন—'আহা বাবা, পাঁচজনে এক জায়গা হয়েছে, প্রাণ খুলে আনন্দ করবার একটা দিন পেয়েছে সব—একটু চীৎকার করবে বই কি! আমারও ত এখনও সাধ হয় ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলমাল করি!'

ভোলানাথবাবু চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বাড়ীর ভিতরের ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ছোট ছেলের দল আনন্দের সংস্পর্শে হেতু না বুঝিয়াও কলরব করিয়া নাচিতেছে।

ইলেকট্রিক তার খাটাইতেছিল জন দুই মিস্ত্রী। তাহার মধ্যে একজন চীৎকার করিতেছিল—'একঠো টুল—নেহিতো কুর্সী! বাবুজী!'

ভোলানাথবাবু হাঁকিলেন—'সুধাংশু! সুধাংশু! শ্যামল শ্যামল!'

বাহিরের ঘরে বাড়ীর জোয়ান ছেলের দলের বিপুল হাস্যধ্বনিতে বৈঠকখানার খাপরার চাল যেন থর থর কাঁপিতেছিল।

নাপিতটা অত্যন্ত অসহায়ের মত ব্যর্থ চীৎকার করিতেছে—'মাঈজী ! মাঈজী ! মা-ঈ-জী !'

রন্ধনশালায় ভোলানাথবাবুর ভাই রমানাথবাবু হাঁকিতেছিলেন—'কাঠ কাঠ, এ আক্‌লু ! আক্‌লু !'—

ভোলানাথবাবুর ছোট মেয়ে মিনু আসিয়া বলিল—'বাজনা কখন আসবে ঠাক্‌মা ! জল সইতে যাবে আর কখন ?

মা হাসিয়া বলিলেন—ঐ দেখ, ওরা আবার লোক পাঠিয়েছে ! ঐ যে সব জানালায় ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, শুনছে—কি হয় ! তা' বাজনা বিয়ের একটা অঙ্গ—ওতে আর অমত ক'রে না বাবা ! পাঠিয়ে দাও কাউকে। এই ত চামার বস্তীতে গেলেই পাবে !'

ভোলানাথবাবু বলিলেন—'তা হ'লে রবীনকে পাঠিয়ে দি, ও এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।'

মিনু সঙ্গে সঙ্গে সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া ছুটিল—'আসছে, আসছে, হ'য়ে গেছে মা !'

ওদিকে জানালার সম্মুখের ভিড় সিগন্যাল পাইয়া হুড়াহুড়ি করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে কলরব—'হয়েছে—হয়েছে। আসছে—আসছে ! রৌশনচৌকী, রৌশনচৌকী !'

কে একজন আনন্দের আতিশয্যে শাঁখটা লইয়া সজোরে বাজাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বাজিয়া উঠিল—উলু লু লু লু লু লু ! ভোলানাথ বাবুর মা বিপুল দেহভার লইয়া একরূপ ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন—মুখে তাঁহার মুখভরা হাসি।

একজন নাতনী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—'বাজনা এলে আপনাকে কিন্তু নাচতে হবে ঠাক্‌মা !'

ঠাকুমার অধর-লীন হাস্যরেখা এবার সরস হইয়া ঝরিয়া পড়িল, তিনি বলিলেন—সে তুই নাচবি, অনিমা নাচবে, শ্যামা নাচবে, চিনু নাচবে৷'

ওদিকে একসঙ্গে কয়জনে সশঙ্ক চীৎকারে বলিয়া উঠিল—'আহা-হা ! তোল্ তোল্ ! ওঠ-ওঠ !'

পরক্ষণেই তুমুল হাসি ! রাণুর পিসতুত দিদি স্থূলাঙ্গী শ্যামা কলতলায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পড়িয়া পড়িয়া সেও এখন সবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছিল, হা-হা-হা-হা !

*　　*　　*　　*　　*

আধঘণ্টা পরেই দুয়ারে রৌশনচৌকী বাজিয়া উঠিল। সানাইয়ের সুডৌল সুরে চর্ম্মবাদ্যের সুমিষ্ট ধ্বনিতে, মন্দিরার ধাতব ঝঙ্কারে এক মুহূর্ত্তে যেন বিবাহ-বাড়ীর প্রচণ্ড কলরবের অন্তরালবর্ত্তী সঙ্গীত ঝঙ্কারময় অংশটুকু রূপ পরিগ্রহ করিয়া অপরূপ হইয়া উঠিল ! প্রভাত রৌদ্র যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। বাড়ীখানার প্রাণের আনন্দবার্ত্তা যেন দিগদিগন্তে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

বাহিরে রাস্তার উপর লোকের ভিড় জমিতেছে। বাড়ীর ছেলেরা কলরব থামাইয়া বাজনার কাছে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুমা একটা কাজের ছুতা করিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে ফিরিবার পথে বলিলেন, 'কেমন সুন্দর লাগছে বল ত।'

এমন সময় ভোলানাথবাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'মাসীমা, মাসীমা! মাসীমা এসেছেন মা! আসুন, আসুন!'

একটি বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী মহিলা মন্থর গমনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরণে গেরুয়া রঙের সেমিজ, গেরুয়া রঙের কাপড়, চোখে চশমা, মাথার চুলে অধিকাংশই পাক ধরিয়াছে, তবুও চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত।

—'মা মা! মাসীমা এসেছেন, মাসীমা।

ভোলানাথবাবুর মা ফিরিয়া আগন্তুককে দেখিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

মহিলাটী তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'আমি এলুম দিদি!

ভোলানাথবাবুর মা তাঁহার হাত ধরিয়া এবার বলিলেন—'এস ভাই এস। আজ রাণুর বিয়ে হৈম। ভুলুর মেয়ে রাণু। এই আমি ভাবছিলাম —গিয়ে তোকে ধ'রে নিয়ে আসব।'

*　　*　　*　　*　　*

বহুদিনের কথা। ভোলানাথবাবুর মা ও হৈমবতী তখন প্রথম যৌবনের তুটি সখি। উভয়ের স্বামী কর্ম্মসূত্রে বেহারের এই শহরটিতে আসিয়া পাশাপাশি তুইখানি বাড়ীতে নীড় বাঁধিয়াছেন। হৈমবতীর স্বামী ছিলেন উকীল; ভোলানাথবাবুর বাপ কাজ করিতেন সরকারী দপ্তরে।

বেলা দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা কাজেকর্ম্মে বাহিরে গিয়াছেন, হৈমবতী দাইকে সঙ্গে করিয়া এ বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া

বলিয়াছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম দিদি! এই পাশের বাড়ীতে এসেছি আমরা। বাপ রে, এই কেউড়ী মেউড়ীর দেশে কথা না কয়ে পেট ফুলে মারা যাবার জো!'

ভোলানাথবাবুর মায়ের কোলে তখন তাঁহার মেজ মেয়ে ছয় মাসের শিশু নিভা তারস্বরে কাঁদিতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, 'আস্থন—আস্থন!'

হৈম বলিল, 'নাঃ তবে আর আসা হ'ল না দিদি। আমি বললুম দিদি, আর আপনি বলছেন আস্থন!'

ভোলানাথবাবুর মা বলিলেন—'তা হলে তোমারও যে আপনি বলা সাজে না ভাই। তুমিও তুমি বল!'

হৈম তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, 'কই তোমার মেয়েকে দাও দিদি আমায়; আমায় ভাই তুমি এক গ্লাস জল দাও—আর একটা পান।'

ভোলানাথবাবুর মা জলের গ্লাসটা দিয়া পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন, 'তোমার ছেলেপিলে কি ভাই?'

হৈম বলিল—'মহাজনের খাতক এখনও হয়নি দিদি!' বলিয়া হাসিয়া নিভার গাল টিপিয়া আদর করিয়া আবার বলিল—'এঁরা সব মহাজন দিদি, নিজের পাওনা আদায় করতে আসেন এঁরা।'

এমন সময় ঘরের মধ্যে নিভার বড় বোন বিভা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হৈম বলিয়া উঠিল—'ওমা, ইনি আবার কিনি?'

বিভার মা হাসিয়া বলিলেন—'আমার বড় মেয়ে। বিভা, উঠে আয় এখানে।'

যাদুকরী

বৎসর দেড়েকের শিশু ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বিছানার উপর বসিয়া বসিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়ি নিভাকে তাহার মায়ের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া হৈমবতী ছুটিয়া গিয়া বিভাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিল।

—'ও দিদি, এ যে খাসা, চমৎকার। এ্যাঁ, কেমন রেশমের মত চুলগুলি দেখ ত! নাঃ, এই ভাল দিদি, ও তোমার এখনও কেমন প্যাঁক প্যাঁক করছে—নাড়তে চাড়তে ভয় হয়, মনে হয়, হাতপাগুলা বুঝি খ'সে পড়ে যাবে। এই—একেই আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

তারপর ক্রমে ক্রমে দুইটি বধূর সখিত্ব ক্রমশ নিবিড় হইতে নিবিড়তম হইয়া উঠিল।

* * * *

হৈমবতীর স্বামী বিশ্বনাথবাবু ছিলেন বিশিষ্ট ধরণের মানুষ। রাশি রাশি বই ছিল তাঁহার জীবনের প্রিয়তম বস্তু। আইন ব্যবসায়েও তাঁহার ক্ষমতা ছিল প্রচুর, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কৃতী পারদর্শী উকিল বলিয়া খ্যাত হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সম্পদ নিম্নাভিমুখিনী জলস্রোতের মত তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার বাগান, বাড়ী মনোহর সজ্জায় আকাশে মাথা ঠেলিয়া উঠিল। বিশ্বনাথবাবু সন্ধ্যার পর লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিতেন—'আমার কাছে বসে খানিকটা পড় দেখি। আচ্ছা আমার কতটা পড়া হয় আর তোমার কতটা হয় আজ দেখব!'

হৈমও সঙ্গে সঙ্গে বই লইয়া বসিত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই চঞ্চল হইয়া বারবার আড়চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিত তিনি কি করিতেছেন।

বিশ্বনাথবাবু টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে বইয়ের মধ্যে তখন ডুবিয়া গেছেন! হৈম বইখানা ফেলিয়া দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজির হইত গিয়া দিদির বাড়ী।

—'পালিয়ে এলুম দিদি, মাস্টারের মত পড়াতে বসেছিলেন।' বলিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া সে গড়াইয়া পড়িত। তারপর বিভা, নিভা, দিবা, নিশিকে লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিত। বিভার মাকে বলিত— 'তোমার কত্তা এলে ব'ল দিদি, পালাব সঙ্গে সঙ্গে।' নিভাকে কোলে টানিয়া বলিত, 'এইটেকেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে গো, মেমসায়েব, আমার পুতুল, নীল নীল চোখ, তুধের মত রঙ, লালচে চুল—ডলি— আমার ডলি!'

কোন কোন দিন বিশ্বনাথবাবু হৈমর পলায়নের কথা জানিতে পারিতেন। তিনি হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিতেন—'পালাচ্ছ'।

হৈম চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইত, তারপর বলিত, 'হ্যাঁ পালাচ্ছি।' ঐ আবার পারে নাকি মানুষে! ওদিকে দিদির বাড়ীতে ছেলেগুলো বোধ হয় কাঁদছে এতক্ষণ। দিদির কত কাজ, একলা মানুষ, আমি না গেলে ওরা আবার ঘুমোবে না।'

আরও বৎসর তিনেক পর। তখন নিভার মায়ের দ্বিতীয় পুত্র সবে মায়ের কোলে আসিয়াছে। আঁতুড় হইতে বাহির হইবার দিন ভোর

না হইতেই হৈমবতী আসিয়া হাজির। আচার-আচরণ বিধি-ব্যাপারের সমস্ত ভার তাহার উপর।

শুচি-স্নানান্তে নিভার মা ছেলে কোলে লইয়া বসিতেই হৈম কোল পাতিয়া বলিল—'দাও দিদি। ও মা গো, এ যে বড় সুন্দর হয়েছে—সকলের চেয়ে সুন্দর।'

ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সে যেন স্থির মূক হইয়া গেল। নিভার মা একটু দূরে রৌদ্রে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—'কি হ'ল রে হৈম, তুই যে বড় বকছিস নে।'

চমক ভাঙিয়া হৈম বলিল—'একে কিন্তু আমায় দিতে হবে দিদি।'

নিভার মা হাসিয়া বলিলেন—'তুই সবাইকে নিয়েছিস—ও-ই বা বাদ থাকবে কেন? সব্বাই ত থাকে তোর বাড়ীতে তুই-ই ত সকলকেই মানুষ করলি।'

হৈম বলিল—'না দিদি, এ সে দেওয়া-নেওয়া নয়, একেবারে আমায় দিতে হবে! ওকেই আমি আমার সমস্ত কিছু দিয়ে যাব।'

নিভার মা বিস্মিত নেত্রে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হৈম তখনও বলিতেছিল—'আমি ওকে বিলেত পাঠাব; খুব বড় বিদ্বান করব আমার মাণিককে। নাম দেব কি জান দিদি, নাম দেব মাণিক।'

নিভার মা কাছে আসিয়া বসিয়া নিজেই কোল হইতে ছেলেটিকে লইয়া বলিলেন—'তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, তোরও ছেলে পিলে হবে। সকলেরই কি আর সকাল সকাল ছেলে হয়। কত জনের—'

—'তুমি আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিলে দিদি?'

নিভার মা অপ্রতিভভাবে হেমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। হেম আবার বলিল—'তুমি আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিলে দিদি?'

*   *   *   *   *

বিশ্বনাথবাবু লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া শুনিলেন, হেম অসুস্থ। হেম সেই যে গিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল আর ওঠে নাই। বিশ্বনাথবাবু গিয়া হেমের ললাট স্পর্শ করিতেই সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথবাবু সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন—'কি, হ'ল কি হেম?'

—'ওগো,'—বলিয়া হেম আর বলিতে পারিল না, অশ্রুর বন্যায় তাহার মুখ আবার ভাসিয়া গেল।

বহুকষ্টে সমস্ত কথা বলিয়া হেম বলিল—'আমি দেবতার দোরে হত্যে দেব।'

বিশ্বনাথবাবু হাসিয়া বলিলেন,—'অনর্থক পণ্ডশ্রম, আর শরীরের কষ্টের চেয়ে ডাক্তার দেখান ভাল। চল, কালই তোমায় নিয়ে কলকাতায় যাব।'

হেম অকূলে যেন কূল পাইয়া হাসিমুখে উঠিয়া বসিল। পরদিনই বিশ্বনাথবাবু হেমকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বাড়ী ঘোরা হইল। সে নানা পরীক্ষা। একদা ডাক্তারদের অভিমত লইয়া আসিলেন বিশ্বনাথবাবু। ব্যগ্রভাবে হেম প্রশ্ন করিল,—'ডাক্তারেরা কি বললেন?'

—'সে অনেক কথা। ওষুদ পত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

—'না, তারা কি বলেছে বল।'

—'দেখ, আমাদের শরীর-যন্ত্রের নানা রকম ব্যাপার আছে। তার মধ্যে কারও কোনটা খুঁত থাকে! সেটা অবশ্য দুর্ভাগ্য। কিন্তু করবে কি, তার ওপর ত হাত নাই।'

হৈম বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া চোখের জলে বালিশটা ভিজাইয়া দিল।

অতঃপর দেব-দ্বারের পালা। বিশ্বনাথবাবুর যুক্তি হৈম মানিল না; দেখিতে দেখিতে সে তপস্বিনীর মত দেব-সেবায় মাতিয়া উঠিল।

হৈম নিভার মায়ের বাড়ী আসা বন্ধ করে নাই। পরের ছেলের জন্য কেন যে তাহার চিত্ত চঞ্চল হয় সে বোঝে না, কোনমতে সে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না, তাহাকে আসিতে হয়।

নিভার মা বলেন—'তুমি যে ডুমুর-ফুল হয়ে উঠছ হৈম!'

হৈম বলে—'আর দিদি, দিনরাত্রি দেবতা দেবতা করেই গেলুম; দেবতাই একবার দেখব।'

তাহার চোখ যেন চক চক করিয়া ওঠে।

ছেলেরা মাসীমার সাড়া পাইয়া চারিদিক হইতে কলরব করিয়া ছুটিয়া আসে—'মাসীমা! মাসীমা!'

নিভাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হৈম বলে—'ডলি যে আমার দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। ডলি—ডলি রে—এঁ্যা।'

নিভার মা বলেন—'তুমি বদ্দিনাথে একবার হত্যে দিয়ে দেখলে না কেন?'

হৈম বলে—'তাই যাব দিদি। চল না তুমি শুদ্ধ—যাবে?"

হাসিয়া নিভার মা বলেন—'দেখছ ত আমার গোরাপল্টনের দল, এদের নিয়ে যাব বললেই কি যাওয়া যায়।'

হেম মনের কথা বলিতে সাহস পায় না। সে ফিরিয়া আসিয়া বৈদ্যনাথধাম যাত্রার আয়োজনেই লাগিয়া পড়ে।

যাইবার দিন হেম দিদিকে বলিল—'দিদি, বলতে ভয় হচ্ছে, যদি নিভা কি বিভাকে আমার সঙ্গে দিতে'—

দিদি হাসিয়া বলিলেন—'দেখছ ত ভাই, আমি একা মানুষ, আর সব কাচ্চা বাচ্চার দল, বিভা নিভা বড় হয়েছে—আমার সাহায্য হয়।'

* * * * *

বিশ্বনাথবাবু নিজে অবিশ্বাসী হইলেও হেমের অভিপ্রায়ে তিনি বাধা দিলেন না। একাদিক্রমে পাঁচটি বৎসর হেম নানান সাধু ও দেবতার দুয়ারে ব্যর্থ তপস্যা করিয়া ফিরিল। সর্ব্বশেষ দেবদ্বার হইতে ফিরিবার পর একদিন নিভার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিছু হ'ল হেম, কোন আশা পেলে ?'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হেম বলিল—'কিছু বুঝলুম না দিদি।'

সেদিনের সভায় আরও কয়জন প্রতিবেশিনী উপস্থিত ছিল, একজন বলিল—'তোমার ও মিথ্যে হচ্ছে ভাই কপালে না থাকলে হয় না। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর না; তোমার এত সম্পত্তি, এত টাকা, একটি পুষ্যি নাও না কেন ?'

হেম তাহার দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—'আপন সন্তান কি কেউ পরকে দিতে পারে ?'

প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিল—'কত নেবে তুমি? নাও না—আমারই পাঁচটা ছেলে রয়েছে, একটা নাও না।'

হৈম আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রতিবেশিনী উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া বলিল—'নেবে? যেটি তোমার পছন্দ হয়, তাকেই দেব আমি।'

হৈম কহিল—'না।' বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীর বহির্দ্বারে সবে সে আসিয়াছে, তখন তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল, প্রতিবেশিনীটি ব্যঙ্গভরে বলিতেছে—'হবে নারে বাঁজার ছেলে, কার্ত্তিকেরও বাবা এলে!'

তাহার আজ কিন্তু দুঃখ হইল না, বেদনাতুর মুখে মৃদু হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল।

বিশ্বনাথবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—'মা হতে পারবে হৈম?'

হৈম অগাধ বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বনাথবাবু বলিলেন—'আজ পনের যোল জনের মত জলখাবার ক'রে রেখো।

অপরাহ্নে বার-তেরটি কিশোর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। বলিলেন—'এরা সবাই তোমার ছেলে হৈম। এরা তোমায় ডাকবে মাতাজী, আর তুমি বলবে বাচ্চা। এদের এখানে ব্যায়াম চর্চ্চার, জ্ঞান চর্চ্চার আখড়া করে দিলাম। রোজ আসবে এবং তুমি এদের পরিচর্য্যা করবে। এদের তুমি মানুষ ক'রে তোল—এদের মা হও।'

হৈম বিপুল স্নেহে কনিষ্ঠকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সে যেন আজ সর্ব্বকাম্য পরিপূর্ণরূপে পাইয়া গেল।

কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই ছেলের দলে ভাঙন ধরিল। একটি দুটি করিয়া ছেলে কম পড়িতে আরম্ভ হইল।

হৈম জিজ্ঞাসা করিল—'এরা আসছে না কেন বীরেন ?'

বীরেন ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'জানিনে ঠিক।'

হৈম বলিল—'তুমি কাল এদের ডেকে নিয়ে এস। না—আমিই যাব।'

পরদিন ছেলেদের বাড়ী গিয়া ছেলেদের দেখা পাওয়া ত দূরের কথা, তাহাদের গৃহে প্রবেশের অধিকারও পাইল না। অধিকন্তু যে কুৎসিত তীব্রতম জ্বালাময় বিষ কণ্ঠে লইয়া ফিরিল তাহাতে তাহার মনে হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এটা ইহলোক নয়—এ নরক। সন্তানহীনতার পাপে যে নরক জীবের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই নরকের মধ্যে কৃমিকীটের মত অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সে বাস করিতেছে।

বাড়ী ফিরিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিল সে মরিবে! সে বিষ সংগ্রহ করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। অনেক ভাবিয়া সে সমস্ত খুলিয়া লিখিয়া শেষে লিখিল, 'এ আমার আর সহ্য হইতেছে না। মানুষের মধ্যে বাস করিতে আমি আর পারিব না। তাই—'

খপ করিয়া পিছন হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া বিশ্বনাথবাবু বলিলেন—'ছি, হৈম!'

বিশ্বনাথবাবু কখন আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, হৈম জানিতেও পারে নাই। হৈম স্বামীকে দেখিয়া আছাড় খাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন,—'কেঁদ না হৈম, ভয় কি, দুঃখ কি। আমি তোমায় এমন রাজ্যে ঘর গড়ে দেব—যেখানে মানুষ থাকবে না।''

হৈম বলিল—'শুধু মানুষ নয়,—দেবতা ভগবান যে রাজ্যে নাই, তেমন রাজ্যে আমি বাস করতে চাই।'

বিশ্বনাথবাবু হৈমের হাত ধরিয়া লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন—'এই রাজ্যে তোমার ঘর গড়ে দেব হৈম, এখানে ভগবান নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, মানুষ নেই। শুধু একা তুমি থাকবে। পারবে?'

হৈম বলিল,—'পারব।'

*　　*　　*　　*

সত্যই বিশ্বনাথবাবু এক অপূর্ব্ব রাজ্যের দুয়ার হৈমবতীর সম্মুখে খুলিয়া দিলেন। আজ ত্রিশ বৎসর হৈমবতী স্বামীর সঙ্গে সেই রাজ্যের মধ্যে বাস করিতেছে। মাস কতক আগে বিশ্বনাথবাবু মারা গেলেন, হৈম তাঁহার দেহ দাহ করিল না, বাড়ীর বাগানের মধ্যে সে তাঁহার সমাধি নির্ম্মাণ করিল। নিজে সে সন্ন্যাসিনী সাজিল, গেরুয়া কাপড় পরিয়া সংসারের সহিত বাকী সংশ্রবটুকুও শেষ করিতে মনস্থ করিল।

নিভার মা সেদিন আসিয়াছিলেন।

তিনি অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'কি করবে বল ভাই, ভগবানকে ডাক, তাঁর স্মরণ নাও।'

তিনি দুটি হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

হৈম তৎক্ষণাৎ নিজের পায়ের ধূলা নিজের মাথায় লইয়া বলিল—'আমার ভগবান আমি নিজে দিদি। সান্ত্বনা আমি পেয়েছি।'

নিভার মা অবাক হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন,—'আমি উঠি হৈম, মাঝে মাঝে যেয়ো আমার ওখানে, একা মন খারাপ হয়!'

হৈম উত্তর দিল—'মানুষের রাজ্য আমি ছেড়েছি দিদি। আমার রাজ্য ছেড়ে যাবার আমার সময় হয় না।'

নিভার মা দুঃখিত হইয়া চলিয়া আসিলেন।

যাক। তারপর আপন মনোমত প্রণালীতে স্বামীর শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ করিয়া হৈমবতী আবার সেই ঘরটিতে ঢুকিয়া বসিল।

দেওয়াল ঢাকিয়া সারি সারি কাঁচের আলমারীর মধ্যে পুস্তকের রাশি ঝকমক করিতেছিল। সে একখানা বই টানিয়া লইয়া বসিল। নাস্তিক্যবাদের একখানা বই। বহুবার এই বইখানা সে পড়িয়াছে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর কেন যেন সে বুঝিল না, বইখানা আর ভাল লাগিল না; সেখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে আর একখানা টানিয়া লইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর সেখানাও রাখিয়া দিয়া আর একখানা লইয়া বসিল। ক্রমে ক্রমে টেবিলের উপর বই স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে সে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ওদিকে স্বামীর চেয়ারখানা শূন্য পড়িয়া আছে। একা থাকিতে থাকিতে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। উঃ! জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে দেখিল, রাস্তায় মানুষ চলিয়াছে! সমস্ত দিনটা সে সেই লইয়া কাটাইয়া দিল।

দিন কয় পর সে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। অজানা পারিপার্শ্বিকের বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী কোটী কোটী মানুষের মেলায় আসিয়া তাহার বড় ভাল লাগিল। অপেক্ষাকৃত শান্ত সুস্থ মন লইয়া মাস চারেক পর সে ফিরিল।

বাড়ী-ঘর ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার সে আপনার রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া বসিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, দিন পনেরর মধ্যেই আর সে ভাল লাগিল না।

দিন কয় পর, সে লাইব্রেরী ঘরে পড়িতেছিল, অকস্মাৎ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির শব্দে সে সচকিত হইয়া চাকরটাকে প্রশ্ন করিল—'ও কি রে?'

—'সাদী, মাঈজী! ও বাড়ীতে ভোলাবাবুর বেটীর সাদী হোবে।'

—'ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দেত'।'

চাকরটা জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

হৈম বইখানা লইয়া গভীর মনযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল!

বিবাহের বাসর। বর-কন্যা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া আছে! চারিদিকে সুসজ্জিতা কৌতুকোচ্ছলা যত পুরনারীদের মেলা।

—'গান গাও না ভাই, বর।'

—'আপনারা আগে গাইবেন। আমি ত অতিথি আপনাদের।'

—'এই ইনি গাইবেন। খুব ভাল গাইতে পারেন। গাও না ভাই!'

বরের পিছনে দেওয়ালে বিলম্বিত একখানা আয়নার মধ্যে হৈম আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল।

—'মাঈজী!'

দরজায় ধাক্কা মারিয়া চাকরটা ডাকিতেই, হৈম চমকাইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। এ কি! বই হাতে করিয়া অতীতের কোন বিবাহ বাসরের স্মৃতি স্বপ্ন সে দেখিতেছে!

বইখানা রাখিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিল।

চাকরটা বলিল—'মাঈজী, বাজারের ফেরৎ নোটের রূপেয়া।'

হৈম বলিল—'তোর কাছেই থাক।'

রৌশনচৌকীদার সঙ্গীতে, বিবাহবাড়ীর আনন্দের আহ্বান বাজিতেছে। উছল আনন্দ কলরব! ওই শাঁখ বাজে!

উদ্‌গ্রীব হইয়া হৈম সঙ্গীত ঝঙ্কার শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সহসা সে চাকরটাকে ডাকিল—'বংশীয়া!'

—'মাঈজী!'

চাদরটা গায়ে দিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ভুলুর মেয়ের বিবাহের বাসরে সে গান গাহিবে নাচিবে।

ভোলানাথবাবুর মা তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। হৈম বলিল —'কই, আমার রাণু ডার্লিং কই? আমি কিন্তু আজ বাসরে গান গাইব দিদি, নাচব! আর আমার নাতি নাতনীদের চিনিয়ে দাও—আমি রং খেলব যে।
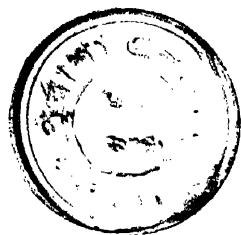
প্রত্যাবর্ত্তন

পুকুরের মাছ বর্ষায় বাহিরের জলস্রোতের সংযোগে বাহির হইয়া যায়। নালা নদী নদ সমুদ্র ঘুরিয়া সে অবশ্য আর পুকুরে ফিরিয়া আসে না ;—কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যা ঘটে তাই ঘটিল। আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ দূরের কথা—মা পর্য্যন্ত চিনিতে পারিল না।

পরনে নীল রঙের পাৎলুন, ফুলহাতা কোমরটুকু অবধি খাটো জামা, জামার পিছনে পিঠের উপর আবার একটা চৌকা ফালি, মাথায় বিচিত্র টুপি—এই পোষাকপরা লোকটিকে দেখিয়া জেলেপাড়ার সকলে ভাবিয়াছিল কোন অদ্ভুত দেশের মানুষ। লোকটি পরম আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জেলেদের বিপন অর্থাৎ বিপিনের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। পিছনে একপাল ছেলে জুটিয়াছিল, সে দাঁড়াইতেই ছেলেগুলিও দাঁড়াইয়া গেল। বিচিত্র পোষাকপরা লোকটির দৃষ্টি জীর্ণ পতনোন্মুখ বাড়ীটার দিকে পড়িতেই সে দৃষ্টি চকিত হইয়া উঠিল—ভ্রু কুঞ্চনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রশ্ন। পিছন ফিরিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া হাতের একটি আঙুল নাড়িয়া সে ডাকিল—এই কাম ইয়ার, ইধার আও! শুন্ শুন্—ইথানে শুন্। এ-ই-ছো-করা!

যে ছেলেটি সম্মুখে ছিল সে চট করিয়া পিছু হটিয়া চার-পাঁচ জনকে আড়াল রাখিয়া দাঁড়াইল। সে চার-পাঁচ জনও পিছনে যাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি সুরু করিয়া দিল। লোকটি কৌতুক বোধ করিয়াও ঘৃণার সহিত বলিল—শূয়ার-কি-বাচ্চা!

তারপর সে বাড়ীর ভাঙা দরজাটা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাঙা-ভগ্ন, উহারই মধ্যে ভাল অবস্থার ঘরখানার দাওয়ার উপর বসিয়াছিল এক প্রৌঢ়া;—খাটো-ছেঁড়া একখানা কাপড় পরিয়া কতকগুলো গুগ্‌লি শামুকের খোলা ভাঙিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে সন্ত্রস্ত হইয়া রূঢ় শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কে? কে গো তুমি?

আগন্তুক একমুখ হাসিয়া বলিল—মা!

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার মাথার টুপিটা খুলিয়া আগন্তুক বলিল—চিনতে পারছিস্ না মা? হামি পশুপতি! কথাগুলিতে অদ্ভুত একটি টান—'শ'কারগুলি সব কেমন শিসের মত তীক্ষ্ণ, উচ্চারণে শব্দগুলি যেন কেমন বাঁকা।

পশুপতি? পশু? পশো? প্রৌঢ়ার হাত দুইটি নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল; ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আকুল প্রশ্নভরা চোখে আগন্তুকের দিকে প্রৌঢ়া নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হারানো ছেলে 'পশো'—পশুপতি? লম্বা, রোগা, দুরন্ত পনের বছরের ছেলে দশ বৎসর আগে পলাইয়া গিয়াছিল জগন্নাথের পাণ্ডার সঙ্গে;—সেই পশুপতি? পশো?

আগন্তুক আগাইয়া আসিয়া বলিল—চিনতে পারছিস্ না মা?

সত্যই প্রৌঢ়া চিনিতে পারিতেছিল না ; পরনে অদ্ভুত পোষাক—সায়েবদের পোষাকও সে দেখিয়াছে—এ পোষাক সেই ধরণের হইলেও ঠিক তেমন নয় ; নীলবর্ণ এ এক অদ্ভুত পোষাক। জেলের ছেলে পশুপতি—যে কেবল নেংটির মত এক ফালি কাপড় পরিয়া থাকিত, কালো রং, নির্ব্বোধ বোকা চেহারা, জলে থাকিয়া যাহার সর্ব্বাঙ্গ চুলকনায় ভরিয়া থাকিত,—সেই পশুপতি—পশো ? মাথার পিছন দিকটা একেবারে কামানো—সামনের বড় বড় চুলগুলো আইবুড় মেয়েদের মত পিছনের দিকে আঁচড়ানো, চোখে মুখে এমন একটা চালাক-চতুর ভাব, এই কি সেই ?

আগন্তুক এবার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দাওয়াটা বার দুয়েক ঝাড়িয়া লইয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—বহুৎ মুল্লুক ঘুরে এলাম মা। জাপান চীন বিলাত মার্কিন মুল্লুক ঘুরলুম। জাহাজে খালাসী হইয়েছিলাম। সে আবার একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ বৎসর আগের একখানি কিশোর মুখের ছবির সহিত এই মুখখানি ক্রমশ মিলিয়া এক হইয়া আসিতেছিল—এক বিচিত্র জ্যামিতি ও পরিমিতির আঙ্কিক নিয়মে বিভিন্ন কালে পরিবর্ত্তিত একখানা জমির মত। নাকের বাঁকা ভাবটি ঠিক তো—সেই তো ! ঠোঁটের কোণ দুইটার ঠিক তেমনই নীচের দিকে টান ! ভুরু দুইটা তো তেমনি মোটা !

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আগন্তুক বলিল—বুঢ্‌ঢা কাঁহা ?—শূয়ার-কি বাচ্চা ?

বুঢ্‌ঢা—বিপিন জেলে—এই বাড়ীর মালিক, প্রৌঢ়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। পশুপতির সৎ-বাপ।

প্রৌঢ়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল—বুড়ো মইছে বাবা—আমাকেও মেরে যেইছে। পথে বসিয়ে গেল বাবা, সব দিয়ে যেইছে 'বেটী'দিগে।

বিপিন মরিবার সময় সব দিয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাদের।

পশুপতি হাসিয়া বলিল—মর গেয়া বুঢ্ঢা, শূয়ার-কি-বাচ্চা ?

দশ বৎসর পূর্ব্বে পশুপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। দুরন্ত নির্ব্বোধ জেলের ছেলে, সৎবাপ বিপিনের পোষ্য ছিল। বিপিন ছিল এখানকার মধ্যে অবস্থাপন্ন জেলে—এ অঞ্চলের ভাল ভাল পুকুর সে জমা করিয়া লইত, অদূরবর্ত্তী নদীটার খানিকটা অংশও সে খোদ সরকারের কাছে জমা লইত একা। বিপিন মাছ ধরিতে যাইত পশুপতিকে সঙ্গে যাইতে হইত ; জলের তলায় কোন কিছুতে জাল আটকাইলে বিপিন পশুপতিকে জলে ডুবিতে বাধ্য করিত। জলের তলায় বুক যেন ফাটিয়া যাইত। পশুপতি জলের তলায় হাতড়াইয়া ফিরিত—কোথায় কিসে আটকাইয়াছে জাল। কতবার যে বোয়াল চিতলের কামড় সে খাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। মাছ ধরিয়া ফিরিয়া বিপিন পশুকে পাঠাইত কাঠ সংগ্রহে। সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া পশুকে সে নিয়মিত প্রহার দিত। সেবার জগন্নাথের পাণ্ডার লোক আসিয়াছিল রথযাত্রার পূর্ব্বে যাত্রী সংগ্রহে। কেমন করিয়া জানিনা এই বিদেশবাসীর সহিত পশুর আলাপ জমিয়া যায়। তাহার এটা, ওটা কাজকর্ম্ম করিয়া দিত, এঁটো বিড়ি প্রসাদ পাইত, আর গল্প শুনিত। জগন্নাথের মন্দির, তাঁহার রথ—সে রথ নাকি আকাশ ছোঁয়, রথের উপর জগন্নাথ নাকি হাঁটিয়া আসিয়া চড়েন, লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয় ; মধ্যে মধ্যে সে রথ নাকি আটকাইয়া যায়, লক্ষ

লোকে টানিলেও সে রথ চলে না, তখন পাণ্ডারা জগন্নাথকে তিরস্কার করে—তবে সে রথ আবার চলে। সেখানে নাকি সমুদ্র আছে, তালগাছের সমান উঁচু এক একটা ঢেউ—নীলবর্ণ জল, সমুদ্রের নাকি ওপার নাই।

পাণ্ডার লোক যাত্রী লইয়া ট্রেনে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়া সন্ধান পাইল ট্রেনের বেঞ্চের তলায় লুকাইয়া শুইয়া আছে—পশুপতি। ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্দ্ধমান তখন পার হইয়া গেছে। হাওড়ায় পৌছিয়া ট্রেন থামিল। নির্বিকার পাণ্ডা, হাওড়ায় রেলকর্ম্মচারীর হাতে পশুকে সমর্পণ করিয়া যাত্রীর দল লইয়া চলিয়া গেল। নিঃসম্বল পশু, একখানি মাত্র জীর্ণ কাপড় তাহার পরনে; রেল-কর্ম্মচারী তাহাকে সঁপিয়া দিল কনেস্টবলের হাতে। কিল; চড় ও কয়েকটা গুঁতা দিয়া কনেস্টবলটা তাহাকে আনিয়া পুরিল হাজতে। হাজত হইতে কোর্ট—কোর্টের বিচারে কয়েক দিনের জন্য তাহার জেল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড কালো রঙের ঢাকা একখানা গাড়ীতে তুলিয়া তাহাকে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল। আশ্চর্য্যের কথা অতি দ্রুত এতগুলি অবস্থান্তরের মধ্যেও পশু কোন দিন কাঁদে নাই। একটা সভয় বিস্ময়ের অতিরিক্ত আর কিছু সে অনুভব করে নাই। যে কষ্টে মানুষের কান্না আসে তেমন কষ্ট এই অবস্থান্তরের মধ্যে ছিল না। অন্ততঃ তাহার কাছে ছিল না। কষ্ট অনুভব করিল বরং জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর। বিরাট শহর—বড় বড় বাড়ী—অসংখ্য পথ—যে পথ পিছনে ফেলিয়া আসে—সে পথ আর খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, গাড়ী—গাড়ী আর গাড়ী, মানুষ আর মানুষ। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া সে যখন অকস্মাৎ অনুভব করিল—সে হারাইয়া গেছে, যে পথ ফেলিয়া আসিয়াছে

সে পথ আর বাহির করা যাইবে না—তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। সমস্ত দিনটা সে কাঁদিয়াছিল। মায়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, গাঁয়ের জন্য কাঁদিয়াছিল। তার পর সব সহিয়া গেল। ভিক্ষা করিয়া মোট বহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল অদ্ভুত একটা স্থানে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ী—মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধানো নদী—নদীর উপর বড় বড় বাড়ী ভাসিতেছে। বাড়ী নয়—জাহাজ। আশপাশের লোকজনের কাছেই সে শুনিল ও-গুলা জাহাজ। বড় বড় মুই লাগাইয়া মোট মাথায় লোক উঠিতেছে, নামিতেছে, আকাশের উপরে একটা মুই লোহার দড়িতে প্রকাণ্ড বোঝাগুলাকে বাঁধিয়া লইয়া জাহাজের উপর আপনি তুলিয়া লইতেছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় চোঙা মধ্যে মধ্যে চোঙা হইতে কি ভীষণ ধোঁয়ার রাশি। অদ্ভুত লাগিল পশুপতির। জায়গাটার নাম শুনিল—খিদিরপুরের ডক। কত মানুষ—কত রকমের সায়েব। সুন্দর নীল পোষাক। খাটো মাথার সায়েবগুলার ছোট ছোট চোখ—খ্যাঁদা নাক—পশুপতির বেশ লাগিল। পরে শুনিল—উহারা জাপানী সায়েব। পশু ওইখানেই থাকিয়া গেল। কিছু দিনের মধ্যেই সে অনেক শিখিয়া ফেলিল। আকাশে যে মইগুলা জিনিস টানিয়া তোলে—ও-গুলা—"কেরেন"। জাহাজের গোল চোঙাগুলা চিম্‌নী! জাহাজের উপরের ঘরগুলি—কেবিন। জাহাজের ভিতরে—পাতালের মত গহ্বরটাও ক্রমশঃ তাহার পরিচিত হইয়া উঠিল। কল-ঘরের ভিতরেও সে দেখিল—সে দিন সে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। বাপ রে! চারি পাশে রেলিং-ঘেরা পিছল সিঁড়ি—নীচে ওই পাতালে নামিয়া গিয়াছে; মধ্যে ঝক্‌ঝকে বিরাট যন্ত্রপাতি। সে কি উত্তাপ—আর সে কি শব্দ!

খিদিরপুরের একটা খোলার পল্লীতে সে থাকিত, সেখানে কত লোক, কত জাতি। চীনাম্যান, মগের মুলুকের লোক, চাটগাঁয়ের খালাসীর দল, গোয়ানী,—মধ্যে মধ্যে সায়েব-খালাসীর দু-চারজনও মাতাল হইয়া আসিয়া জুটিত। কত প্রহারই সে যে প্রথম প্রথম খাইয়াছে। বড় হইয়া অবশ্য সেও কত জনকে প্রহার দিয়াছে। কত গল্প সে শুনিত, দেশ-দেশান্তরের কথা—বার্মা মুলুক, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, জাপান, মার্কিন, বিলাত, ফেরান্স—কত দেশ কত শহর। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত ; পশুপতির পায়ের রক্ত মাথার দিকে উঠিত। সমুদ্রের গল্প—কূল নাই, দিক্ নাই শুধু সমুদ্র আর আকাশ, আকাশে ওড়ে কত পাখী—জাহাজের আশে পাশে ঘোরে হাঙ্গর, করাতের মত সারি সারি দাঁত—মধ্যে নাকি তিমিও দেখা যায়। আর ঝড়—আকাশ-ভরা কাল মেঘের কোল হইতে ঝড় নামিয়া আসে, সমুদ্রে তুফান উঠে সে তুফানে সমুদ্র যেন জাহাজ লইয়া লুফিতে থাকে। জাহাজের ডেক ভাসাইয়া জল চলিয়া যায়, কত সময় সেই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া যায় কত জন। ‘কালাপানি’ আর ‘মাডারিনে’ (মেডিটেরিনিয়ান) নাকি ঢেউ খুব বেশী। পশুপতি স্তব্ধ হইয়া শুনিত। একদা ঐ খালাসীদের সঙ্গেই জাহাজের আপিসে নাম লেখাইয়া একটা জাহাজে করিয়া সে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কত বার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, কতবার গিয়াছে ; এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে—এক মুলুক হইতে অন্য মুলুকে !

দীর্ঘ দশ বৎসর পর সহসা কি মনে হইয়াছে—কেমন করিয়া জানি না মনে পড়িয়াছে মাকে—গাঁকে, সে কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছে।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না, অপরাধ যাহাই হউক মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্ম্মরাজতলায় জমিয়াছিল। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই মদ ও মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল।

একটা বড় বাঁশের ঝুড়ি উপুড় করিয়া সেইটার উপর বসিয়াছে পশু, তাহার পরনে সেই পোষাক। সে নিজে এক বোতল পাকিমদ আনিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা ইহারই মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। মজলিসে চলিতেছে হুঁকা—সে টানিতেছে সিগারেট। দুই পয়সা দামের সিগারেটের বাক্স অনেকগুলিই সে সঙ্গে আনিয়াছে।

এক ছোকরা উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—জ্ঞাত মশাইরা গো!

সমস্বরে দশ-বারো জনে বলিল—চুপ-চুপ-চুপ! তাহারা মজলিসের গোলমাল থামাইতেছিল।

—নিবেদন পাই!

—বল! বল!

—আজ্ঞে, পশু আমাদের খুব বাহাদুর।

—নিচ্চয়! একশো বার।

—কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল।

—হাঁ-হাঁ-ঠিক কথা!

—তা, বেলাত গেলে আর জাত যায় না। এই আমাদের গেরামের

ছোট হুজুরের ছেলে যেয়েছিল বেলাত, দেখেন তার জাত যায় নাই।

—ঠিক। ঠিক বটে!

—তা' পশুর কেনে জাত যাবে?

—নিচ্চয়।

—কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়েছে—

এক জন বলিল—আরও দশ টাকা লাগবে। তা না দিলে—যাবে, উয়োর জাত যাবে। আমি বলছি যাবে।

পশু বলিল—দশ রূপেয়াই দিবে হামি।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলিল—একবার হরি হরি বল!

সমস্বরে সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। তার পর আরম্ভ হইল গল্প। পশু গল্প আরম্ভ করিল—দেশ-দেশান্তরে লৌকিক-অলৌকিক। একবার একজন আরব দেশের শেখকে তাহারা সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল। বুঝলি—জাহাজের ছামুতে মানুষটা—এই ভেসে উঠছে—বাস, ফিন্ ডুব যাচ্ছে। তিনবার-চারবার। তখুন সারং বললো নামাও—বোট। নৌকো! নৌকো! বোট হ'ল নৌকো। বাপরে সিখানে কি হাঙ্গর—মাছের পোনার ঝাঁকের মতুন—কিলবিল করছে হাঙ্গর। তারই অন্দরমে মানুষ। তাজ্জব রে বাবা!

মজলিসসুদ্ধ মেয়েপুরুষ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। পশুপতি বলিয়া গেল বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে—লোকটাকে যখন তুললুম রে ভাই—তখুন বলব কি, তাজ্জব কি বাত—লোকটাকে ছোঁয় নাই হাঙ্গরে। জাহাজসুদ্ধ লোকের তাজ্জব লেগে গেল। বাপ রে! বাপ রে! মানুষটার জ্ঞেয়ান হ'ল—সারং উকে পুছলো—কেয়া নাম, কাঁহাকে আদমী,

দরিয়ামে গিরলে, ক্যায়সে। আদমীঠো বললো, আরবী সেথ উ। দুসরা একটা জাহাজমে বম্বই যাচ্ছিলো। নামাজ পড়তে পড়তে গিরে যায় সমুন্দরে। বললো কি জানিস্? বললো—পড়লো তো ছুটে আইলো হাঙ্গর দশঠো, বিশঠো। তো, উ বললো—দুহাই আল্লাকে, দুহাই পয়গম্বরকে—মৎ কাটো হামকো। বাস্ হাঙ্গর ছুতে পারলে না। তার পর তো ভাই, সারং তার করলো—উ লোকটার জাহাজে। তারসে ফিন্ খবর আইলো—বাত ঠিক। উ জাহাজ তখুন একশো মাইল চলে গিয়া।

এমনি কত গল্প।

তার পর আরম্ভ হয় গান—নাচ। পুরুষেরাই নাচে গায়, মেয়েরা দেখে।

পশুপতি নিজে নাচে। পা ছুড়িয়া ছুড়িয়া অদ্ভুত নাচ। বিচিত্র সুরে শিস্ দিয়া গান করে। মত্ত মজলিসে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। পশুপতি নাচ শেষ করিয়া বলিল—সবসে ভাল নাচ জোড়া মিলকে নাচ। বড়া বড়া ঘর, শালা, আলো কতো—আসবাব কি বাজনা কি—আঃ হায়-হায়! সুদূর দেশের আলোকোজ্জ্বল আনন্দোৎসবের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে হায় হায় করিয়া সারা হইল। সহসা উৎসাহিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—দেখবি সি নাচ, দেখবি?

—হাঁ-হাঁ। নিচ্চয়।

পশুপতি বোতল হইতে আর এক চুমুক মদ গিলিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া লইল—একটা সিগারেট ধরাইয়া বার কয়েক টানিয়া এক জনকে দিয়া, সে করিয়া বসিল একটা কাণ্ড। খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বসিয়া-

ছিল মেয়েদের দল। পশুপতি ব্যবধানের সেই খানিক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েদের দেখিয়া লইয়া, নবীন জেলের যুবতী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ঠিক পারবে, আয় উঠে—আয়!

মজলিসে একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

০ ০ ০

পশুপতি মত্তদৃষ্টিতেও নৃত্যসঙ্গিনী পছন্দ করিতে ভুল করে নাই। নবীনের মেয়েটি সুশ্রী তন্বী তরুণী।

মজলিসে ভীষণ হৈ-চৈ উঠিল; নবীন ক্রোধে ফুলিয়া গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল—মেরেই ফেলাব শালাকে।

নবীনের ছেলেটা অতিরিক্ত মদ খাইয়াছিল। সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চীৎকার করিতেছিল—না না না, উ হবে না। ছেড়ে দাও, 'মাকে ছেড়ে দাও, উকে আমি ছাড়ব না—ছেড়ে দাও বলছি। অবশ্য তাহাকে কেহই ধরিয়া ছিল না, বারণও তাহাকে কেহ করে নাই।

নবীন বলিল—আমার মেয়েকে উকে সাঙা করতে হবে।

পশুপতি ইয়া বড় একটা ছুরি হাতে নির্ভয় কৌতুকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, সে বলিল—বাস্ মাৎ চিল্লাও, সাঙা করব হামি। ই বাত আছে কসুর হইছে সাঙা করব হামি।

তন্বী তরুণী মেয়েটি সুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী। জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়েটির মত মেয়ে দেখা যায় না। পর দিন সুস্থ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আফশোষ করিল না। জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহাদের

স্বভাব বটে একটু উচ্ছলা কিন্তু এ মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত। কাঁচ ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ধীর।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল। উ মেয়ে সর্ব্বনেশে মেয়ে বাবা। বেউলো রাঁড়ী, তিন বার বিয়ে হয়েছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে ; উ হবে না বাবা।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিন বার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে, দ্বিতীয় বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে, ছয় বৎসরে। ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায়—তার পর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই। বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতেরো-আঠারো বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান। মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল ; জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না। জালের ভিতর কি বজবজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল ; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল। তার পর একবার সে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায়। পর মুহূর্ত্তে যে ডুবিল আর উঠিল না।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন ; তাহার বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভাল লাগিল।

পর দিন সকালে উঠিয়া পশু নবীনের বাড়ী গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ্ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী পুত্রবধূ গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি-করিয়া-ধরা মাছ বেচিতে, বাড়ীতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্ত দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ ক'রেছিস ?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—গোস্ত রাঁধতে জানিস ? মান্‌সো-মান্‌সো ?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি জানাইল—হ্যাঁ।

তু মদ খাস ? মদ ?

এবার মেয়েটি সেই দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভরঘুরে উচ্ছৃঙ্খল পশুপতিকেও যে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল। কিন্তু পশুপতি ইহাতেই বেশী মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটি, ছোট একখানি ঘর, ছেলে-মেয়ে—পশুপতি কল্পনা করিল অনেক। পুলকিত-প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে বিবাহের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মা আপত্তি করিল, কিন্তু সে কানেই তুলিল না। শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল, একখানা ঘর তাহাকে কিনিতে হইবে। মাকে সুদ্ধ লইয়া সংসার করা তাহার পোষাইবে না। সে পাড়ার প্রান্তে খানিকটা জমি জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত লইয়া সেই দিনই ঘর আরম্ভ করিয়া দিল।

ঘর তৈয়ারী হইলে সে নবীনকে বলিল—ঠিক করো দিন।

সাত দিন পর, দিন ঠিক হইয়া গেল। পশু বলিল—অল্‌রাইট, হামি কলকাত্তা যাবে—চিজ-বিজ কিনতে।

পথে নির্জ্জন একটা গলির ভিতর কে ডাকিল—শোন।

রমাদাসী! সে আজ মৃদু হাসিয়া ডাকিতেছিল—শোন!

রমার মুখে হাসি আজ নূতন দেখিল পশুপতি, সে দ্রুত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রমা আতঙ্কভরে বলিয়া উঠিল—না-না-না।

সে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে পশুও তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

রমা বিবর্ণ মুখে বলিল—এই কবচটি তুমি পর। মা-চণ্ডীর কবচ—আমি এনেছি তোমার লেগে। এক দিন উপোস করে থেকে কবচ এনেছি। সেই কি অসুখ করেছিল একদিন—অসুখ মিছে কথা, উপোস করেছিলাম।

সে নিজেই পরাইয়া দিল—লাল সূতায় বাঁধা তামার একটি কবচ। হাসিয়া রমা বলিল—আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে লয়, রণে-বনে-অরণ্যে মা তোমাকে রক্ষে করবেন!

* * * *

ইহার পর পশুপতির সন্ধানই নাই। কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়া সে আর ফিরিল না।

উপরের কাহিনীটুকু আমার গ্রামের ঘটনা, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম জেলেপাড়ায়—একটি বিচলিত বিহ্বল মুহূর্ত্তে। পশুপতির নিরুদ্দেশের কিছু দিন পরেই পশুপতির ওই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছিল—আমি

পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। দারোগা কি বুঝিয়াছিল—কি লিখিয়াছিল জানি না, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম—তাহা এই। যাহা বুঝিয়াছিলাম—তাহাও মিথ্যা নয়—সে কথা শুনিলাম, আর মাস কয়েক পর, পশুপতির কাছে।

রেডিয়ো আপিসে একটা ছোট নাটিকা দিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম—এক অভিনব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিক আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা চমৎকার লাগিল।

বন্ধুবর হীরেন থিয়েটারী ঢঙে প্রশ্ন করিল—শুনলে ?

দাদা কমলবিলাস গম্ভীর মুখে বলিলেন—শুক্রাচার্য্য করে দিলে তোমাদের।

—মানে ?

—কা-কা-কানা করে দিলে তোমাদের লেখাকে। মধ্যে মধ্যে কমল দাদার কথা ঠেকিয়া যায়।

স্বীকার করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম—সেলারের পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে পশুপতি, সেও আমাকে চিনিল—বাবু !

—হ্যাঁ। তোর গল্প শুনলাম। খুব বেঁচেছিস।

সে হাসিল।

রমার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিলাম—তুই চলে গেলি কেন ?

—আজ্ঞে খিদিরপুরে গেলাম বেড়াতে। জাহাজ দেখলাম—বন্ধুদের

সঙ্গে দেখা হল, আমোদ-টামোদ করলাম রেতে; কি হয়ে গেল, মনে হ'ল কি হবে বিয়ে ক'রে? ত্যাশ বিত্যাশে কত—সে লজ্জায় থামিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম—দেশ-বিদেশের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্র বিলাসিনীদের আকর্ষণ সেদিন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ—তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়—সুতরাং তাহার দোষ কি? প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের—

চিন্তায় বাধা দিয়া পশুপতি বলিল—কিন্তু ভুল হইছিল—মতিচ্ছন্ন হইছিল আমার বাবু। আজ মরে গেলে কি হ'ত? রামদাসীর কবচই আমাকে বাঁচায়া বাবু। নইলে কেউ বাঁচল না—আমি বাঁচলাম! আর—

পশুপতি বলিতে লাগিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজ ফাটিয়া গেল, বিকট শব্দ—দুরন্ত আঘাত—ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার! কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল সে জানে না। জ্ঞান ছিল না তাহার। যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল কে যেন তাহাকে একখানা ভাসমান কাঠের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথা ছিল হাতের উপর—রমার কবচটাই তাহার কপালে ঠেকিয়া ছিল।

কবচটা বাহির করিয়া সে কপালে ঠেকাইল। বলিল—ই কবচ যত দিন রহেগা তত দিন হামারা কিছু হবে না বাবু।

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম রমার কথা।

স্তম্ভিত হইয়া গেল পশুপতি। তাহার সে মূর্ত্তি আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পর সিগারেট ধরাইয়া হাসিয়া সে বলিল—চললাম। সেলাম বাবু!

তাহাকে ডাকিলাম—শোন শোন!

—আজ্ঞে!

—কি করবি এখন?

পিছনে গঙ্গায় স্টীমারের তীব্র সার্চ্চলাইট আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাকার জলকাটার আলোড়ন শব্দ শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে রকমারি আওয়াজের সিটি বাজিতেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি হাসিল, তার পর বলিল—লতুন জাহাজমে চলে যায়েগা। আজকাল খালাসীর ভারী আদর। কেউ যেতে চাইছে না। হাম যায়েগা।

সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথের উপরেই কি একটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল; ছোট শক্ত একটা কিছু। অগ্রসর হইতেই আমার নজরে পড়িল—বিবর্ণ সূতায় বাঁধা সেটা একটা তামার কবচ।

বাউল

প্রৌঢ়ত্ব মানুষটিকে মানাইয়াছে বড় চমৎকার। দীর্ঘ দেহখানি ঈষৎ নমিত। দেহ ভরিয়া একটি শিথিল নমনীয় স্বল্প স্থূলতা মানুষটিকে একটি সৌম্য কোমল রূপ দিয়াছে। টিকলো নাকের নীচের অংশ সাদা গোঁফ সাদা দাড়িতে ভরা। মাথার চুলের মধ্যে এখনও কতকগুলি কালো চুলের রেখা দেখা যায়। যৌবন যে একদিন তাহার দেহমন্দিরে আসিয়াছিল তাহারই পরিচয়স্বরূপ সে তীর্থযাত্রীর মত তাহার গায়ে যেন নাম লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

বাউল মানুষ। পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত খাটো বহির্ব্বাস। তাহার উপর অনাবরিত পরিপুষ্ট দেহ। সম্মুখের দুটী দাঁত ভাঙিয়াছে, সে পরিচয় পৃথিবীময় সে ছড়াইয়া বেড়ায়। বাউলের আগে হাসি পরে কথা। সমস্ত জড়াইয়া বড় ভাল লাগে,—জীর্ণ বলিয়া চোখে কুশ্রী ঠেকে না, পুরাতনীর প্রতি একটা সম্ভ্রম বোধ আছে।

ভিক্ষুক আসিল ভিক্ষা করিতে। ভিক্ষার পথে সে গ্রামে প্রবেশ করিল। উপলপুর গ্রামখানির পশ্চিমপ্রান্তের সর্পিলগতি খালি পথটা

ধরিয়া আসিতে গেলে প্রথমেই পড়ে শ্যামসায়রের পাড়ের উপর চাষা-পাড়াটি। ওই খালি পথ ধরিয়া বাউল আসিয়া চাষাপাড়ায় প্রবেশ করিল। কাঁধে ঝুলি, হাতে একতারা।

তখন পল্লীগ্রামের জলখাবার বেলা। চাষাপাড়ার বকুলতলায় জলখাবার পর চাষীর দল তামাকের আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

ছেলেরাও বসিয়া আছে ওই তামাকের প্রত্যাশায়। তামাক খাইয়া তাহারা গরু খুলিবে।

বিশাল শ্যামসায়রের এপার হইতে ওপার ভাল দেখা যায় না,—ওপারের মানুষকে রেখার মত মনে হয়। কাজল-কাল জল। ঘাটের সীমারেখাটুকু বাদ দিয়া বুকভরা পদ্মবন। পদ্মবনের পাশে তীরের কোলে কোলে শালুক, কলমী, পানাড়ি লতার সারি, বেড়ার মত চলিয়া গিয়াছে।

বাউল পুকুর দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দীঘিটিকে সে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কাহাকে যেন নমস্কার করিল। তারপর গুণ্ গুণ্ রবে গানের একটা কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে চাষাপাড়ায় ঢুকিল। পথের ধারেই বকুলতলার মজলিস। মজলিস দেখিয়া বাউল দাঁড়াইয়া কহিল—একটু আগুন পাওয়া যাবে বাবারা সব—

বুড়াদের আগে ছেলেরা বলিয়া উঠিল—দোব, দোব, একটা গান কর না বাবাজী!

বুড়া নবীন কহিল—আসুন, আসুন বাবাজী, তামাক খাবেন বসুন।

বাউল হাসিতে হাসিতে মজলিসের একপ্রান্তে আসিয়া বসিল। কাঁধের ঝুলিটা নামাইতে নামাইতে কহিল—বহুক্ষণ থেকেই তামাক

খাবার ইচ্ছেটা হয়েছে। কিন্তু আগুনের অভাবে তা' হয়নি। দেশলাইটার কাঠী আর কিছুতেই জললো না। সঙ্গে সঙ্গে ঝুলি হইতে দেশলাইএর বাক্সটা বাহির করিয়া একবার এপিঠ ওপিঠ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। অতি পুরাতন বাক্স,—ঘষিয়া ঘষিয়া ঘর্ষণের স্থানটুকু একেবারে তৈলাক্ত পদার্থের মত মসৃণ হইয়া গিয়াছে। বাবাজী হাসিয়া কহিল—কতদিনই বা আর চলবে? বয়স যে ওর আমারই মত অনেক হ'ল। আগুন কি এ বয়সে বুকে থাকে, না জ্বলে? থাক কত কাজে লাগবে। বাক্সটি সে আবার ঝুলির মধ্যে রাখিল। তারপর কহিল—হাত মুখ একবার ধুয়ে আসি।

শ্যামসায়রের ঘাটে নামিয়া আবার একবার চারিপাশ ভাল করিয়া দেখিয়া কহিল—আহা এ কার পুকুর বাবা?

নবীন কহিল—আজ্ঞে চিনির সরবৎ ঢোল পিটিয়ে দশখানা গাঁয়ের লোককে খাইয়ে তবে শ্যামসুন্দর রায় মাটীর বুকে চোট দিয়েছিল। পাতালের জলে শ্যামসুন্দর রায়ের শ্যামসায়র ভরে আছে।

বাবাজী কহিল—পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়েই সে মহাপুরুষকে আমি প্রণাম ক'রছি। মহাপুরুষের ভিটেটা কোথা বাবা—ধূলো নিয়ে যাব।

নবীন আঙ্গুলে ঠোক্কর দিয়া জলন্ত আঙ্গরাখানা ভাঙিতেছিল—সে কহিল—সে ছোট শ্যামসায়রের পা'ড়ে মাটীর পাহাড় হয়ে আছে! পাকা বাড়ী তিনি করেন নি। বলতেন শুনেছি—মাটিতে এসে মাটীর কোল কি ছাড়ে? তাঁর ছেলেদের কত জেদ তা তিনি কিছুতেই না। কাঁধের গামছায় হাত পা মুছিয়া মজলিসে বসিয়া বাবাজী কহিল—ছেলেরাও করেন নি, না—তিনিই সব শেষ করে গিয়েছিলেন?

মজলিসের কেহ প্রশ্নটা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু নবীন বুঝিয়াছিল —না বাবা, তিনি থাকতে বংশের কারও পায়েও একটা কাঁটাও ফোটে নাই। চার পুরুষ তিনি এক সঙ্গে সংসার করে গিয়েছেন। কিন্তু ওই পরমায়ুই হ'ল তাঁর কাল। চঞ্চলা লক্ষ্মী তিনি থাকতে থাকতেই চলে গেলেন। কারবার ছিল বড়,—ওই বড় দরজার ফাঁক পেয়েই মা পালালেন। কারবারের লোকসানেই সব গেল। ওই পড়ো ভিটেও ও নাকি নীলেম হয়ে গিয়েছে। বাবাজী ওই কথার মধ্যে কি পাইল কে জানে —সে গুণ গুণ করিয়া গান ধরিয়া দিল—'কারও মাথায় সোনার ছাতা কারও ফাটে ব্রহ্মতালু।' গান করিতে করিতেই ঝুলি খুঁজিয়া সে বাহির করিল বাঁশের আঁকা বাঁকা বিচিত্র গঠন একটা নল।

দশ এগারো বছরের একটা দিগম্বর ছেলে হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল—হি-হি-হি এঁকা-বেঁকা সাপের মত হুঁকো দেখ মাইরি— হি-হি-হি।

নবীন তাহাকে একটা ধমক দিল।

বাবাজী কহিল—না-না ভাই ন্যাংটা দাদাকে কিছু ব'ল না। কলি-কাটার আগুন বেশ গমগমে হইয়া উঠিয়াছিল—কলিকাটা বাবাজীর দিকে আগাইয়া দিয়া নবীন পুরাণো কথার সূত্রটা ধরিয়া কহিল—জানেন বাবাজী, এই পুকুর নীলেমে কিনে ঘোষেরা যেদিন প্রথম জাল নামালে সেদিন বুড়ো গিন্নী কেঁদেছিলেন। তাতে কর্ত্তা বলেছিলেন—আমি ত' মাছ খাবার জন্যে পুকুর কাটাইনি গিন্নী, আজ কেঁদো না; যেদিন শ্যাম-সায়রের জল শুকোবে, পুকুরের পাড় থেকে যেদিন খালি কলসী নিয়ে লোকে ফিরে যাবে সেইদিন কেঁদো।

হুঁকা টানিতে-টানিতে বাবাজী কহিল—তুমি সে মহাপুরুষকে দেখেছ কর্ত্তা ?

হাসিয়া নবীন কহিল—দু-পুরুষ আগেকার কথা বাবাজী দেখব কেমন করে—তবে শুনেছি। আমরা আবার গাঁয়ের মোড়ল কি না, আমাদের সব জেনে শুনে রাখতে হয়। তবে ছেলেপিলেদের দেখেছি—ছেলেবয়সে। আমরাও তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ।

বাবাজী কলিকাটি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কহিল—আজ ফিরে এই মহাপুরুষের সায়রের কূলেই রান্না বান্না ক'রে খাব। এখন একবার পাঁচ দোর ফিরে আসি!

ছেলের দলও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল! নবীন কহিল—তোরা কোথা যাবি সব? গরু খুলতে হবে না? পেছন পেছন ছুটছিস যে বাবাজীর?

বাবাজী হাসিয়া কহিল—আমারই ভুল; ওদের দোষ নাই। আমারই যে গান শুনিয়ে যাবার কথা। নয় গো ন্যাংটা দাদা? ন্যাংটা ছেলেটা বিপুল আনন্দে আদিম মানবটির মত একান্ত সরল বেতালা নৃত্য জুড়িয়া দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে লাগিল—

ও-মা, ও-মা মা-টে—গান হবে শুনে যা—শুনে যা

লেড়ো—ও লেড়ো—আয় রৈ—!

বাবাজী পায়ে নূপুর বাঁধিয়া একতারার ঝঙ্কার দিয়া গান সুরু করিল—

সাধে কি তোর গোপাল চাই গো

শোন যশোদে!

তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে—

বলেন অন্ন পাই গো শোন যশোদে !

তালে তালে হাতে ঝঙ্কার দেয় একতারা, পায়ে বাজে নূপুর।

বাবাজী কহিল—গ্রামটা সেধে আসি ভাই মণ্ডল মশায়।

নবীন কহিল—সেবার জায়গা আমি পরিষ্কার করিয়ে রাখছি, এই দিকে ফিরবেন যেন।

বাবাজী হাসিয়া পথ ধরিল।

ছেলের দলও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দু-পহর গড়াইয়া গেল, তখনও গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বাউলের একতারার সঙ্গে নূপুর বাজিতেছিল, আর বাউলের গান ধ্বনিত হইতেছিল—

ভাল ক'রে পড়গা ইস্কুলে—
নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।
বড় ইস্কুল জেলা নদীয়া,
হেডমাস্টার দয়াল নিতাই কেলাসে দেয় তুলে।

পিছনে পিছনে তখনও সেই ন্যাংটা ছেলেটা ফিরিতেছিল।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যায় নবীন জিজ্ঞাসা করিল—বাবাজীর আখড়া কোথায় ?

হাসিয়া বাবাজী কহিল—গাছতলা, বাবা। যেখানে থাকি সেই খানেই, বাউল বৈরাগীর আর ঘর কোথা বল ? তবে আর চলে না, পিজরে হয়েছে জীর্ণ, ঘেরাটোপ না দিলে আর চলে না।

নবীন সাগ্রহে কহিল—তা হ'লে আমাদের এখানেই আখড়া লাগান না বাবাজী। এই শ্যামসায়রের পাড়ে—।

—না বাবা, আর এখানে সেখানে নয়; একেবারে ঠিকানায় গিয়ে উঠব। শ্রীধাম যাওয়ার অভিপ্রায়ই আছে।

—কখন যাবেন বাবাজী? আমার একবার যাবার ইচ্ছে ছিল।

—কেমন ক'রে বলি বাবা কখন যাব? জলের মাছ ডাঙ্গায় কি উঠতে চায়—না ইচ্ছে করলেই পারে? একজন সূতো দিয়ে টানবে তবে ত উঠবে।

নবীন কহিল—তবু রথের সময়,—কি রাসের সময়,—কি দোলের সময়—কখন?

—কখন আর করে বাবা? বাবাজী একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—এই ত বেরিয়েছি পথে আজ বিশ বছর! ভিখ্ মাগ্‌তে মাগ্‌তে পথ চলেইছি। আজও ত' পৌঁছুলাম না। এবার ঠিক করেছি আর না; তিন দিনের বেশী এক জায়গায় আর থাকব না। এখান থেকে আজই যেতাম—তবে মহাপুরুষের কীর্ত্তি অবহেলা করতে পারলাম না। রাত্রিটা কাটালাম। ভোরে উঠেই চলে যাব।

*　　*　　*　　*

তখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি, চাঁদ ঠিক মাথার উপরে ভাসিতেছিল। একটা কোলাহলে বাউলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। কান পাতিয়া বাউল শুনিল, কোলাহলটা যেন আর্ত্ত—বিষণ্ণতা-পীড়িত। নিকটেই কোন বাড়ীতে একটা কিছু ঘটিয়াছে। ত্রস্তপদে লোকজনের চলাচলের শব্দও শোনা যাইতেছিল।

একটা লোক ত্রস্তপদে এই দিকেই আসিতেছিল। বাবাজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে ভাই ?

—সপ্পাঘাত হয়েছে—শেষ কথাগুলি আর শোনা গেল না। লোকটী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া বাউল আপন ঝোলাটী কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। গ্রাম্য রাস্তাটির দুধারে গৃহস্থের ঘর, সকল ঘরেই যেন জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সাড়ার মধ্যে কোথায়ও হাসি বা আনন্দের পরিচয় নাই, সবখানেই শঙ্কাতুর বিষণ্ণ একটী অভিব্যক্তি দীর্ঘশ্বাসের মত ব্যক্ত হইতেছিল। একটা বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া বাউল দাঁড়াইল। এই বাড়ীটীতেই কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হইল। বাড়ীর মধ্যে শঙ্কা-পীড়িত আর্ত্ত কলরব উঠিতেছে। বাউল উঁকি মারিয়া দেখিল ঘরের আঙ্গিনাখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছে। ভরসা করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কোনরূপে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া সে দেখিল পাঁচ ছয় বৎসরের একটী শিশুকন্যা বিষজর্জ্জর অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। ওপাশের বারান্দায় মেয়েদের কান্নার ধ্বনি উঠিতেছিল। একটী কণ্ঠের রোদনধ্বনি মর্ম্মান্তিক হইয়া সকল স্বর ও সুরকে ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। কণ্ঠস্বরে বোধ হইল তরুণকণ্ঠ। বাউল বুঝিল কোন তরুণী মাতার স্বপ্নের ধন এটী।

—ভিড় ছাড়ো না হে বাপু, ভিড় ছাড়ো।

নবীন লোকগুলিকে সরাইয়া দিয়া কহিল—এর ওপর ভিড় কল্লে ত' ভাল হবে না ভাই। বসনা কেন সব,—ওই দাওয়ার ওপর উঠে বস সব।

মাতব্বরের কথায় ভিড় সরিয়া গেল।

এতক্ষণে বাউল শিশুটীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। শ্যাম-

বর্ণের কচিমুখ—খুকী একটী। বাউল একটু অগ্রসর হইয়া নবীনকে কহিল—কেমন বুঝছ ভাই? মুখ তুলিয়া নবীন কহিল—আপনি? আসুন, আসুন।

কিন্তু ভাল আর বুঝছি কই? কি হে ওস্তাদ—কেমন বুঝছ? যে লোকটী ঝাড়ফুঁক করিতেছিল, সে মুখে কিছু বলিল না, বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িল শুধু।

নবীনের সহসা কি যেন মনে হইল। সে ব্যগ্র ভাবে বাউলকে কহিল—আপনারা ত' গুণীলোক। যদি জানেন-টানেন বাবাজী তা' হ'লে একবার দেখুন না!

বাউল সেই ওস্তাদকে কহিল—তোমার দেখা শেষ হ'ল ভাই?

লোকটী হতাশার একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। কহিল—আপনি দেখবেন?

বিনীতভাবে হাসিয়া বাউল কহিল—একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। যখন এ বিদ্যে শেখা গিয়েছে তখনই ওস্তাদের কাছে এ প্রতিজ্ঞে করতে হয়েছে। আপনিও গুণীলোক সবই ত' জানেন।

শিশুটীকে আপাদমস্তক বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া বাউল যোড়হাত করিয়া কহিল—গুণীলোক যারা আছেন, তাঁদের পায়ে পেণাম করছি আমি। আমার শিক্ষা সামান্যই। তবে যদি পারি সে গুরুর আশীর্ব্বাদ আর আপনাদের দয়া। কেউ যেন কোন অনিষ্ট করবেন না।

তারপর নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া লইয়া নবীনকে কহিল—একটু দুধ চাই যে ভাই, কাঁচা দুধ।

নবীন ব্যস্তভাবে একজনকে কহিল—গাইটা দুইয়ে ফেল দেখি শিগগীর!

বাউল আসন করিয়া বসিয়া নানা মন্ত্র অদ্ভুত স্বরে আওড়াইতে আরম্ভ করিল। সে উচ্চারণ ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে যেন একটা মোহের সৃষ্টি করিতেছিল। দর্শকমণ্ডলীর গুঞ্জনালাপ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গেছে।

সহসা মন্ত্রোচ্চারণ ক্ষান্ত করিয়া বাউল কহিল—এসেছিস? আরে তুই যে নেহাৎ শিশু। এরই মধ্যে—নাঃ তোর আর দোষ কি বল? দোষ যদি কারও থাকে—তবে তোর মুখে যে বিষ দিয়েচে—এ স্বভাব দিয়েছে, তারই দোষ! তুই কি করবি?

লণ্ঠনের আলোকে বিস্তৃত প্রাঙ্গন ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। সকলে মনোযোগ সহকারে দেখিয়া, দেখিতে পাইল একটি সর্পশিশু, গোখুরা সাপের বাচ্ছা, বাউলের সম্মুখে ছোট্ট ফণাটি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাউল দুধের বাটীটা তাহার মুখের কাছে আগাইয়া দিল। কহিল—তোকে আমি অমৃত দিচ্ছি। নে—খা। তোর বিষ তুই তুলে নে। অমৃত ফেলে দিয়ে যা ছেলের দেহে।

সর্পশিশু দাঁড়াইয়া রহিল, বিষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছোটি ফণাটি মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। বাউল আবার মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—

দোহাই—দোহাই, মহাদেবের দোহাই, যার মাথায় নাচিস, পায়ে

লুটোস তোরা। দোহাই মা বিষহরির দোহাই! দোহাই আস্তিক মুনির দোহাই।

সর্পশিশুর উদ্যত বিস্তৃত ফণা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত ও নত হইতেছিল।

বাউল উচ্চকণ্ঠে কহিল—জয় জয় নীলকণ্ঠের জয়। দোহাই মা বিষহরির।

মহাকাল যদি তোকে পাঠিয়ে না থাকে তবে তুই আমার কথা শোন—আমার ওস্তাদের আজ্ঞে রাখ।

আশ্চর্য্যের কথা সর্পশিশু এবার আজ্ঞা পালন করিল। পাত্র হইতে দুগ্ধ পান করিয়া আবার শিশুকে দংশন করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাউল তাহাকে সুকৌশলে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—না-না এখানে তোর থাকা হবে না। ওই শিশুর ওপর আক্রোশ তোর যাবে না। আর নাগে নরে বাস হয় না। চল নির্জ্জনে রেখে আসব তোকে। একটা হাঁড়ি দেবেন ও মণ্ডল মশায় আর একটা সরা।

একটা হাঁড়ির মধ্যে সর্পশিশুকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। তারপর একটী শিকড় বাহির করিয়া নবীনের হাতে দিয়া বাউল কহিল—জল ঢালুন খুকীর মাথায়। জ্ঞান হবে। জ্ঞান হ'লে এই শিকড়টী গোল মরিচের সঙ্গে বেটে খাইয়ে দেন। তিনটী গোল মরিচ।

সাপের হাঁড়িটী হাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি তরুণী মেয়ে আসিয়া বাউলের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—না--না, যেয়োনা বাবাজী, তুমি যেয়ো না।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাউল পিছাইয়া গেল। কহিল—কি কর মা—

কি কর? রাধে রাধে কি অপরাধে ফেল্লে মা তুমি? রাধারাণীর জাত তোমরা। ওঠ মা ওঠ। আমি ত যাই নি, যাব না।

নবীনও পথ আগুলিয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল —এখন যাওয়া হবে না বাবাজী।

—না ভাই, আর কোন ভয় নাই। ওই দেখ খুকীর জ্ঞান হচ্ছে। আমি এটাকে ছেড়ে দিয়ে আসি। বন্ধন করে কি কাউকে রাখতে আছে?

—আপনি কিন্তু যেতে পাবেন না আজ। ভোরবেলা আপনি যে চলে যাবেন তা হবে না।

এলায়িত তনু শিশুটীর দিকে চাহিয়া বাউল কহিল—থাকব ভাই থাকব।

* * * *

বাউলের যাওয়া হয় নাই।

আজ যাই—কাল যাই করিয়া যাত্রার দিন স্থির হয় কিন্তু একটা না একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাউলের শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—প্রায়ই অসুস্থতা বোধ তাহাকে যেন অবসন্ন করিয়া তোলে। নবীন কহিল—এত তাড়াতাড়ি কি বাবাজী? পথও পড়ে আছে—দিনও পড়ে আছে। শরীর খারাপ তখন বিশ্রাম করে সেরে উঠেই যাবেন।

বাউল নবীনের মুখপানে চাহিয়া থাকে; অতি অসহায় ক্লান্ত সে দৃষ্টি। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহে—তাই দেখি।

নবীন কহিল—বাবাজী খড়ে বাঁশে একখানা চালা এইখানেই তুলে দি—

তাড়াতাড়ি বাবাজী কহিল—না-না মণ্ডল মশায়—সে থাক।

তারপরই সে একতারাটী বাজাইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। প্রথমেই আসিয়া দাঁড়ায় খুকুমণির দুয়ারে। বাহির হইতেই সে ডাকে—মা হও গো গরীবের।

খুকুমণির মা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। বাউল আশীর্ব্বাদ করে—রাজরাণীর মা হও মা।

বাউলকে প্রণাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসের আক্ষেপ সে সহ্য করিতে পারে নাই। মনে মনে প্রতি-প্রণাম করিয়া বাউল আত্ম-অপরাধ স্খালন করিয়া লয়। তারপর কহে—আমার মা কৈ গো, আমার মা!

কচি শিশু-মুখখানি, ঘরের দেওয়ালের আড়াল হইতে উঁকি মারে। মৃদু মৃদু সে হাসে। তাহার মা চুপি চুপি গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনে। খুকী হাত পা আছড়াইয়া কাঁদে,—না—না আমি মা হব না, মা হব না।

বাউল হাসিয়া কহে—ছেড়ে দাও মা ছেড়ে দাও।

মা ছাড়িয়া দিতেই সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আবার সেই দেওয়ালের আড়াল হইতে উঁকি মারে আর মৃদু মৃদু হাসে। কৌতুক ভরে কহে—এই ভাই—আমাকে মা বলছে। এত বুড়ো!

এবার সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হয়। সে হাসির ছোঁয়াচ বাউলকেও স্পর্শ করে—সেও হাসিয়া সারা হয়।

অপরাহ্ণে ভিক্ষা-প্রত্যাগত বাউল গাছতলায় রান্না চাপায়। সম্মুখের

পরিষ্কার স্থানটুকুতে ছেলের দল উপদ্রবে কলরবে একটা বিপর্যয় বাধাইয়া তোলে। দুচারজন বয়স্ক লোকও থাকে, তাহারা ধমক দিয়া বলে—

বেরো—বেরো—বেরো সব এখান থেকে।

বাউল হাঁ-হাঁ করিয়া উঠে—না-না-না। গোপালের দল সব, ওরা নইলে আঙিনা সাজবে কেন?

—ওই নেন, ঠেলা নেন গোপালের। মারামারি আরম্ভ করলে।

বাউল দেখিয়া হাততালি দিয়া উঠে, কহে—দেখব, দেখব—কে হারে কে জেতে! স্থবল হারল, স্থবল হারল। বলিহারি শ্রীদাম বলিহারি! এইবার দাম আর বস্থদাম লড়াই হোক। না, ভাই স্থবল, কাঁদলে হবে না ভাই। হেরে গিয়ে কাঁদে না কি? এস এস একখানা বাতাসা নাও, খেয়ে জোর করে ওকে হারিয়ে দেবে। না—না—দাম আজ লড়াই থাক। এস সব নাম ডাকি।

নিজের একতারাটা লইয়া সে গান ধরে, পিছনে নাচিতে নাচিতে শিশুর দল কলরব করিয়া গায়—

মা-টীতে চাঁদের উদয় দেখবি যদি আ-য়।
যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নি, দেখসে নদীয়ায়।

মধ্যস্থলে গান থামাইয়া বাউল অগ্রসর হইয়া ব্যগ্রভাবে কহে—এস, এস আমার মা এস গো।

খুকীর মা খুকীকে বাউলের আঙিনার একপাশে নামাইয়া দিল। সে শ্যামসায়রের ঘাটে জল লইতে আসিয়াছিল। মা কহিল—খুকু তুমি তোমার ছেলের কাছে বস, আমি জল ক' ঘড়া তুলে নি।

খুকী উত্তর দিল না। সে বাউলের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

বাউল একটু দূরে বসিয়া কহিল—আমার মা হবে না তুমি?

খুকী ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—হব।

বাউল সঙ্গে সঙ্গে বাহু বিস্তার করিয়া কহিল—ছেলের কোলে এস মা।

এবার আড়ষ্ট ভাবে খুকী হাত বাড়াইল। তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া গায়ে লম্বা দাড়ী বুলাইয়া দিয়া কহিল—দি দি দাড়ী লাগিয়ে দি।

কাতুকুতুতে খুকী খিল খিল করিয়া হাসিয়া আকুল হইল।

এমনি করিয়া মা-ছেলেতে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে।

নবীন হুঁকা টানিতে টানিতে আসিয়া কহিল—এ বেলা শরীর কেমন বাবাজী?

বাবাজী একটুখানি চমকিয়া উঠিল—এ প্রশ্নটা যেন সে প্রত্যাশা করে নাই। সে কহিল—শরীর?—খুব ভাল নাই।

একটু পর আবার হাসিয়া কহিল—এ যে শরীর ভাল না থাকারই বয়স ভাই।

নবীন কহিল—একখানা চালা কাল থেকে আরম্ভ করে দি। এই গাছতলায় খোলা জায়গায় অসুখ শরীরে কি থাকা হয়।

বাবাজী চুপ করিয়া রহিল।

নবীন উৎসাহভরে কহিল—কালই শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত লোক লাগলে কতক্ষণ?

বাবাজী খুকীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

চালা উঠিল শ্যামসুন্দর রায়ের পড়ো ভিটার উপর।

*　　　*　　　*　　　*

বর্ষার শেষ হইতেই নবীন কহিল—বাবাজী, একখানা ঘর করুন।

বাউল শিহরিয়া উঠিল। অবশেষে সে শুধু কহিল—ঘর ?

—হ্যাঁ ঘর একখানা করুন। বোষ্টম, সাধু, সন্ন্যাসী আসে সব। তাঁরা ইচ্ছা হলে থাকবেন, সাধু বোষ্টমের সেবা হবে।

বাউল কহিল—না বাবা, বত্রিশ বন্ধন আর থাক।

নবীন কিছুতেই মানে না।

খুকীর মা খুকীকে কোলে করিয়া আসিয়া কহিল—ঘর করতেই হবে।

খুকী কহিল—আমরা মা বেটাতে থাকব।

কথাটা খুকীর মায়ের শিখাইয়া দেওয়া।

বাউল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নবীনকে কহিল—ভেবে দেখি ভাই।

নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে বাউল তুলসী গাছটার পরিচর্য্যা করিতেছিল—আর ভাবিতেছিল। ভাবিয়া যে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। সাগরের কূলে আসিয়া মুক্তার পরিবর্ত্তে শুক্তির খোলা কুড়াইতে মাতিয়া থাকিবে সে !

তুলসী গাছটীর বেদীটি বর্ষার জলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল ; কিছু মাটী দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

হাতার ডাণ্ডাটা লইয়া চিন্তান্বিত মনে সে মাটী খুঁড়িতে বসিল। কিন্তু স্থানটা বড় কঠিন, আর অস্ত্রটাও খুব উপযুক্ত নয়। এদিক ওদিক

দেখিতে দেখিতে নজরে পড়িল—একটা জায়গা খুঁড়িয়া কাহারা মাটী লইয়া গিয়াছে, সেই গর্ত্তটা বেশ নরম হইয়া আছে। বাবাজী সেই গর্ত্তটায় নামিয়া মাটী খুঁড়িতে বসিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সহসা শব্দ উঠিল ঠন্-ঠন্-ঠন্! বাবাজী চমকিয়া উঠিল, তাহার চিন্তার সূত্র কাটিয়া গেল। আবার সে আঘাত করিল,—আবার সেই শব্দ উঠিল। কোনও ধাতু পাত্রে অস্ত্রটার আঘাত লাগিতেছে যেন। বাউল উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া সে আবার গর্ত্তটায় নামিল। আশ-পাশের মাটী খুঁড়িয়া স্থানটায় বেশ করিয়া মাটী চাপা দিল।

অপরাহ্নে ছেলের দল আসিয়া জুটিল কিন্তু নাম গান আজ জমিল না। বাবাজীর শরীর তেমন ভাল নাই। বুড়ার দলও চলিয়া গেল। নবীন কহিল—বাবাজী ঘর করে ফেলি, আপনি আর অমত করবেন না।

বাবাজী অন্যমনস্ক ভাবেই কহিল—হ্যাঁ, তাই দেখি।

নিস্তব্ধ রাত্রে বাবাজী ডিবেটা জ্বালাইয়া আবার সেই গর্ত্তে নামিল। খুঁড়িয়া বাহির হইল একটি ঘটি। বাবাজীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পিত হস্তে মুখের মাটী ছাড়াইয়া বাবাজী ঘটীটার ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপও করিল। আছে—আছে—আছে! ঘটীটার ভিতর রৌপ্যের রূপ আলোকের ছটায় ঝলমল্ করিতেছিল। কুঁড়ের মধ্যে আসিয়া ঘটীটা উপুড় করিয়া ঢালিয়া ফেলিল। তারপর কম্পিত হস্তে গণনা আরম্ভ করিল! একবার, দুইবার, তিনবার। দেড়শত টাকা মাত্র। কিন্তু আরও আছে—আরও আছে; ধনী শ্যামসুন্দরের ভিটা এ—এখানে আরও আছে!

* * * *

প্রভাতে নবীন আসিয়া কহিল—কেমন আছেন বাবাজী? একি? রাত্রে কি জর-টর হয়েছিল না কি? চোখ যে বসে গিয়েছে; মুখে যেন কে কালি মাখিয়ে দিয়েছে!

বাবাজীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ।

নবীন চিন্তান্বিত হইয়া কহিল—তাইত এখানে আপনার শরীর বেশ ভাল থাকছে না।

বাউল ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—জায়গার দোষ কি ভাই, বয়সের দোষ।

নবীন কহিল—জায়গার দোষও আছে বৈকি! নাঃ আপনাকে আর এমন করে আটকাব না। আপনি বরং ভাল জায়গা-টায়গা দেখে—

বাধা দিয়া বাউল কহিল—নাঃ কাল ঠিক করে ফেলেছি—আপনাদের কথাটাই ভাল; ঘরই একখানা আরম্ভ করা যাক। কুঁড়ের মধ্যে শীত বর্ষা ভাল ভাবে কাটে না।

নবীন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কহিল—সে ত আমি অনেক দিন থেকেই বলছি। আপনাকে কিছু করতে হবে না। সব আমরা দেব। মাটিত বইতে হবে না, এই ত মাটির পাহাড় হয়ে আছে।

—না-না-না! মহাপুরুষের বাস্তুভিটার মাটীতে হাত দেবেন না। বরং পুকুরের ওই মাটী কেটে—

—তাই হবে। সে বেশ বলেছেন আপনি।

ঘর আরম্ভ হইয়া গেল।

এ পাড়ার লোকগুলি সকলেই নিপুণ, কর্ম্মঠ। মাসখানেকের মধ্যেই

দেওয়াল উঠিয়া শেষ হইয়া গেল। বাবাজীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক খুঁটিনাটিটী চোখে দেখিয়া সুন্দর ভাবে না করাইলে মন খুঁত খুঁত করে। বাবাজী নিজে রায়েদের ভিটা খুঁড়িয়া ইঁট বাহির করিয়া জমা করে। ঘরের মেঝে বারান্দা বাঁধান হইবে।

লোকে বলে—আপনি নিজে কেন বাবাজী, আমরা খুঁড়ে ইঁট বার করে দেব একদিনে।

বাবাজী কহে—বাপরে, বাপরে, মহাপুরুষের ভিটে—এতে তোমরা হাত দিয়ো না ভাই। যদি কিছু হয় আমারই হবে।

খুকুমণি বাবাজীর পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পায়ে এখন চারগাছি রূপার মল উঠিয়াছে, হাতে দুগাছি বালা। বুড়ো ছেলে তাহার দিয়াছে।

রাত্রি ঘনাইয়া আসে। নিস্তব্ধ গ্রামখানির সংসারবদ্ধ জীবগুলি সারাটা দিন স্বার্থের যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তখনও বাউলের বিশ্রাম নাই, একহাতে কেরোসিন ডিবা অন্য হাতে একটা শাবল লইয়া পড়ো ভিটাটার চারিপাশ পরীক্ষা করিয়া বেড়ায়। শাবলটা দিয়া আঘাত করে আর কান পাতিয়া শোনে।

অকস্মাৎ বন জঙ্গলের মধ্যে মর্ম্মর ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠে। দপ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া বাউল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চায় সে দৃষ্টি যেন আগুনের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করে। তাহার শিথিল স্থূল দেহ যেন কঠিন হইয়া উঠে। কাহাকেও দেখা যায় না। কোন নিশাচর জন্তু হয়ত হইবে।

আবার অন্ধকারের মধ্যে বাউল পরীক্ষা করিয়া চলে।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঘরের চাল দরজা জানলা, কার্ত্তিকের ২০শে তারিখের মধ্যে সুসম্পূর্ণ হইয়া গেল।

২৫শে তারিখ ছিল শুভদিন। স্থির হইল ঐ দিন গৃহপ্রবেশ হইবে। গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সেদিন এখানে মহোৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবীন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চাল তুলিয়াছে, চাঁদা তুলিযাছে। তাহার উৎসাহের সীমা ছিল না। সমস্ত আয়োজনের তদারক করিয়া ফিরিতেছিল।

খুকী নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে। তাহার চঞ্চল-চরণে রূপার মল চারগাছি অবিরত বাজিতেছিল—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্।

২৪শে তারিখে সকাল বেলা পাশের গ্রাম সাহোড়ার আখড়ার বাবাজী সমস্ত দেখিতে আসিলেন। তিনি বেশ সম্মানী ব্যক্তি। চারিদিক দেখিয়া তিনি কহিলেন—বাঃ বেশ হয়েছে।

বাউলের আর আনন্দ ধরে না। বাবাজীকে ঘরের সমস্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইতে লাগিল। পিছনে পিছনে ঝুম্ ঝুম্ করিয়া ফিরিতেছিল খুকী।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সাহোড়ার বাবাজী কহিল—ভারী সুন্দর,—চমৎকার হয়েছে বাবাজী! এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করুন আপনি!

খুকীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাউল কহিল—করব। খুকুমণির বিয়ে দোব আসছে বার, আর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব।

খুকী বাউলের মুখখানি ধরিয়া আপনার দিকে ফিরাইয়া কহিল—আমাকে কিন্তু অনেক গয়না দিতে হবে ছেলে।

কৃতার্থতার হাসিতে বাউলের মুখ ভরিয়া গেল, কহিল—দোব মা—দোব।

সাহোড়ার বাবাজী কহিল—কিছু গয়না নেবেন, সস্তায় হবে। আমার সন্ধানে আছে। তবে শীগ্‌গির তার টাকা চাই, অপেক্ষা করতে পারবে না।

ব্যগ্রভাবে বাউল কহিল—কত টাকার জিনিষ হবে?

—শ' দুই সে চায়। জিনিষের দাম অবিশ্যি বেশী হবে।

—নোব, আমি নোব। আপনি দেখবেন যেন হাতছাড়া না হয়। কাল—কালই আমি নোব।

সে সাহোড়ার বাবাজীর হাত চাপিয়া ধরিল।

* * * *

গভীর রাত্রি। নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। বাউল ঘর হইতে বাহির হইল। চোখের দৃষ্টি যেন তাহার জ্বলিতেছিল। হাতের শাবলটা মাটীর বুকে বিঁধিয়া বিঁধিয়া সে প্রোথিত ধনের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। কাল তাহার টাকা চাই। এখনও তাহার আশি টাকা অবশিষ্ট আছে—বাকী এক শত কুড়ি তাহার চাই। একশত কুড়ি কেন—আরও বেশী—দুই শত—পাঁচ শত—না—আরও বেশী। যদি ঘড়া ঘড়া টাকা পাওয়া যায়।

অসম্ভব ত' নয়। শ্যামসুন্দর রায়ের ভিটা এ।

ঠক্—ঠক্!

বাউল খুঁড়িয়া তুলিল একটা পাথর।

সেটাকে বিরক্তিভরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার বাউল আর এক স্থানে পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

জঙ্গলের মধ্যে পাতার উপর কি যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। বাউল ভ্রুক্ষেপও করিল না। মর্ম্মর শব্দে সে আর চমকিয়া উঠে না।

* * *

প্রভাতে নবীন আসিয়া ডাকিল—বাবাজী!

কেহ সাড়া দিল না।

নবীন দাওয়ার উপর বসিল। সে ভাবিল বাবাজী প্রাতঃকৃত্য শেষ করিতে বাহিরে গিয়াছে।

বাহিরে খুকীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিল বাবাজী ফিরিয়াছে।

খুকী ডাকিতেছিল—ছেলে ও ছেলে!

নবীন ডাকিল—বাবাজী!

খুকীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ছেলে ও ছেলে—ওঠ কেন? স্বর তাহার অভিমানরুদ্ধ। নবীন হাসিল,—পথচারী বাউল বাঁধা পড়িয়াছে ভাল। সে বাহির হইয়া উদাসীর মায়ার খেলা দেখিতে গেল।

পথের উপর ত নাই!

ওপাশের জঙ্গলের মধ্যে খুকীর গলা শোনা যাইতেছিল।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নবীন গিয়া দেখিল, বাবাজী একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে। খুকী তাহাকে ডাকিতেছে—ছেলে ওঠ।

শঙ্কিত হইয়া নবীন অগ্রসর হইয়া দেখিল প্রাণহীন দেহ, মুখে অসীম যন্ত্রণার চিহ্ন। মুখ দিয়া গেঁজলা ভাঙিয়াছে।

নবীন খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেই ওদিকে নজরে পড়িল একটা শাবল আর একটা দ্বিখণ্ডিত গোক্ষুরা সাপ।

সাপটাকে কে যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

শ্যামাদাসের মৃত্যু

শ্যামাদাসবাবু রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন—মৃত্যু-রোগশয্যা। সে কথা তিনি জানেন। গভীর-চিন্তাশীল বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক তিনি, এ কথা তাঁহার কাছে অবিদিত ছিল না। লোলচর্ম্মের আবরণীর অভ্যন্তরে কাল-জীর্ণ মধুশূন্য মধুচক্রের মত অসংখ্য কোটি কোষচক্রগুলির স্বরূপ তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি সেগুলির ক্রমজীর্ণতা দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। গভীর প্রশান্ত দৃষ্টিতে খোলা জানালার ভিতর দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন, গাঢ় নীল আকাশ—অসীম রহস্যময় শূন্যমণ্ডল।

দুইটি জিনিসকে জানিবার জন্য ছিল তাঁহার অসীম আগ্রহ, অপরিমেয় কৌতূহল; তাঁহার সমস্ত জীবনটাই কাটিয়াছে সেই সাধনায়, কঠোর, অক্লান্ত, ক্লৈব্যহীন সাধনা। জীবনরহস্য আর মরণরহস্য জানিবার সাধনায় সমস্ত জীবনটাই তাঁহার কাটিয়া গেল! আরম্ভ করিয়াছিলেন বাইশ বৎসর বয়সে, আজ তাঁহার বয়স সত্তর, কিন্তু—। শ্যামাদাসবাবুর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, জীবনরহস্য জানা হয় নাই, জানিবার আর সময়ও নাই। সেজন্য তাঁহার আক্ষেপ নাই, তাঁহার শিষ্য, শিষ্যের

শিষ্য, তাহার শিষ্য, তাহাদেরই উপর রহিল তাঁহার অসমাপ্ত সাধনা সমাপ্ত করিবার ভার। তিনি এখন নিজে ধীরে ধীরে এক গভীরতর রহস্যের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে চলিয়াছেন, দূরত্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর স্বাদ গন্ধ বর্ণ সমস্ত কিছুর উপর ক্রমঘনায়মান কুয়াশার মত একটা লুপ্তির রহস্য ঘনাইয়া আসিতেছে—ওই তার পদ-ধ্বনি। দেহের অভ্যন্তরে, কোষচক্রের অভ্যন্তরে জীবনীমধুর দ্রুত আবর্ত্তন—প্রোটোপ্লাস্‌মকে তিনি জীবনীমধু বলেন—ক্রমশঃ গতিহীন স্থির হইয়া আসিতেছে,—ধাতুবহ্নি নিবিয়া যাইতেছে সে তিনি জানেন; কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত কিছু জানিবার আগ্রহ তাঁহার।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়া গেল।

মাসখানেকের মধ্যেই সংসারে দুইটি মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ছোট ভাই দুর্গাদাস এবং তাঁহার নিজের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী মাসখানেক আড়াআড়ি মারা গিয়াছিলেন।

*   *   *   *

দুর্গাদাস ছিলেন উকিল, অল্প বয়সে তিনি হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই ভাইকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিত, ইন্দ্র-চন্দ্রের মত দুই ভাই। কথাটা অতিরঞ্জন সন্দেহ নাই, কিন্তু দুই ভাইয়ের কৃতিত্ব সত্যই ছিল গৌরবের বস্তু! শ্যামাদাসবাবু নিজে বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, মেডিকেল কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক। একটা মামলা লইয়া দুর্গাদাস মফস্বলে গিয়াছিলেন, টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়া ফিরিলেন। মারা গেলেন বত্রিশ দিনের দিন, অজ্ঞান অবস্থায় চীৎকার

করিতে করিতে তিনি মারা গেলেন। শ্যামাদাসবাবু অবিচলিত ধৈর্যে ভাইয়ের বিছানার পাশে বসিয়া ছিলেন, সব শেষ হইলে তিনি উঠিয়া বাইরে আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের হাসি হাসিলেন। বার বার—বার বার তিনি দুর্গাদাসকে বলিতেন, অন্তত জলটা গরম ক'রে খাবে।

দুর্গাদাস তাঁহার কথা উপেক্ষা করিতেন এমন নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই সতর্ক হইবার মত ব্যগ্রতা তাঁহার ছিল না; চাকরকে বলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ফলে বৈজ্ঞানিক সত্য আপনাকে সপ্রমাণ করিল অতি নিষ্ঠুরভাবে; মেঘের আড়ালে অদৃশ্য শত্রুবিমান নিক্ষিপ্ত বোমার স্পিলণ্টারের আঘাতে অসতর্ক পথচারীর মতই দুর্গাদাস মারা গেলেন।

কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু ধ্রুব—এ কথা তিনি কল্পনা না করিলেও আঘাত অনিবার্য এটা তিনি সেই সময়েই জানিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের ব্যাধিটা টাইফয়েড, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এ কথা ধরা পড়তেই শ্যামাদাসবাবু বাড়ির প্রতিটি জনকে টি-এ-বি ভ্যাক্‌সিন ইন্‌জেক্‌শন লইতে বাধ্য করিলেন। বাধ্য করিতে পারিলেন না কৃষ্ণভামিনীকে। দুর্গাদাসের স্ত্রী পর্যন্ত ভাশুরের কথায় অবনত মুখে নীরবে হাতটি বাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, আর জ্বালিও না বাপু, ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে জ্বর-যন্ত্রণা ভোগ করতে পারব না আমি।

শ্যামাদাসবাবু অনুরোধ করিলেন, অনুনয় করিলেন—অবশেষে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তবে মর।

হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হোক। তোমাদের সকলের বালাই নিয়ে যেন যাই আমি। তা হ'লে আমার মত ভাগ্যিমানী কে?

ও রকম ভাগ্যিমানী হিন্দুর সংসারে ঘরে ঘরে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। হিসেব করতে হলে চিত্রগুপ্তের খাতা চাই। ইংরেজ আমলের আগে জন্মমৃত্যু রেজেষ্ট্রির নিয়ম ছিল না। যাক, এখন ইন্‌জেক্‌শন নেবে কি না?

না।

দুর্গাদাসবাবু মারা গেলেন, কৃষ্ণভামিনী বিছানায় শুইতে বাধ্য হইলেন।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এইবার ওষুধ খাবে তো?

অসুখ করলে ওষুধ না খেলে চলবে কেন?

ইন্‌জেক্‌শন?

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কৃষ্ণভামিনী হাসিলেন—সে এক বিচিত্র হাসি। বলিলেন, ডাক্তার কি বলছে? আমি বাঁচব না?

শ্যামাদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ডাক্তারে তা বলতে পারে না।

কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, ঠাকুরপো চ'লে গেলেন, আমার বাঁচবার জন্যে ইন্‌জেক্‌শন নিতে লজ্জা হয়! কিন্তু মরণ যদি না হয়? তবে মিছামিছি রোগের ভোগ বাড়িয়ে তো লাভ নেই। আমার কষ্টের কথা বলছি না, গোটা বাড়িটা কষ্ট পাবে। তোমার কষ্ট হবে। তখন ইন্‌জেক্‌শনও দরকার হ'লে নিতে হবে বইকি। নেব।

তবে? তখন নিলেই তো হ'ত।

তুমি ব'কো না বাপু; ইন্‌জেক্‌শন নিলেই নাকি অসুখ আমার হ'ত না! কপালের দুর্ভোগ যার যা থাকে, সে যাবে কোথায়?

কপাল? দুর্ভোগ?—হাসিয়া শ্যামাদাস সেদিন বলিয়াছিলেন, সে তোমার নয়, আমার। অবশ্য মনে মনে বলিয়াছিলেন, প্রকাশ্যে বলিলে আর রক্ষা থাকিত না। জীর্ণ দেহে রোগশয্যায় শুইয়া দীর্ঘকাল পরেও শ্যামাদাস সে কথা মনে করিয়া আজ হাসিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে আবার তিনি হাসিলেন, সে হাসি অন্য হাসি।

দুর্ভোগ তাঁহারই বইকি?

জীবনে তাঁহার ও কৃষ্ণভামিনীর মিলনের মধ্যে বিরোধের সংস্থান অদ্ভুত। জীবন-পথে তাঁহাদের যাত্রা ঠিক একটি অন্তহীন সরলরেখার দুইপ্রান্ত অভিমুখে,—ক্লান্তিতে, বিশ্রামে, অবসাদে কখনও পাশাপাশি বসিবার সুযোগ মিলে নাই।

কৃষ্ণভামিনীর যাত্রা ছিল পাপ-পুণ্যের, ধর্ম্ম-অধর্ম্মের, মায়ামোহে বিচিত্র মর্ত্তলোক পার হইয়া জন্মজন্মান্তরের পথে—পরলোকেরও পরপারে স্বর্গলোক অভিমুখে। তারও পরে আছে নাকি এক পরম আনন্দলোক।

শ্যামাদাসের যাত্রা বিপরীত মুখে। তাঁহার পৃথিবী—অত্যুত্তপ্ত ফুটন্ত ধাতবীয় এক পরিমণ্ডলের উপর বারিধিমণ্ডলবেষ্টিত কঠিন স্তরময়ী এই পৃথিবী; এই পৃথিবীর বুকে জীবজীবনের বিবর্ত্তন-পথে—এক কৌষিক দেহ হইতে বহু কৌষিক দেহে, উপাদান হইতে অবয়বের পথে, অবয়ব হইতে শক্তির পথে, শক্তি হইতে গতির পথে, শ্রীর পথে; চেতনা হইতে বোধের পথে, বোধ হইতে বাসনার পথে, ইচ্ছা হইতে

মনের পথে ; মন হইতে বুদ্ধির পথে, জ্ঞানের পথে, বিজ্ঞানের পথে তাঁহার যাত্রা।

কৃষ্ণভামিনী যখন পূজার আসনে বসিয়া ধ্যানস্তিমিত চিত্তে মনশ্চক্ষে দেখিতেন আকাশমণ্ডলের বুক চিরিয়া অদৃশ্যপথে নামিয়া আসিতেছে এক অপূর্ব্ব গঠন জ্যোতির্ম্ময় রথ, সেই রথের মধ্যে জ্যোতির আকর তাঁহার ইষ্টদেবতা, তখন শ্যামাদাসবাবু তাঁর লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া রাশি রাশি বই লইয়া মনের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেন সৌরমণ্ডলের শূন্য-লোকের মধ্যে এক বাষ্পলোক। বিভিন্ন বাষ্পের আলোড়ন সংমিশ্রণ সেখানে। পৃথিবীর বুক হইতে ক্রমশঃ উৰ্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আর এক মণ্ডলে—স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে।

এ কি? অকস্মাৎ সেদিন নজরে পড়িয়াছিল, দুইটা গিনিপিগ বাগানের পথে ছুটিয়া একটা ঝোপের দিকে পলাইতেছে। এ কি? ও দুইটা খাঁচা হইতে বাহির হইল কি করিয়া? বই ফেলিয়া চিন্তা ছাড়িয়া তাঁহার গবেষণাগারে আসিয়া শ্যামাদাস স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—খাঁচার ভিতর বাটিতে দুধ, ভিজা ছোলা! কে দিল? যে দিয়েছে, খাঁচা খুলিবার সময় তাহারই অসাবধানতাবশতঃ ও দুইটা পালাইয়াছে। শ্যামাদাস বরাবরই অত্যন্ত কঠোরচিত্ত লোক! কঠিন ক্রোধে তিনি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কয়েকটা গিনিপিগকে অনাহারে রাখিয়া বিভিন্ন অবস্থায় তাহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কোষচক্রগুলির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

গবেষণাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি চাকরটাকে ডাকিয়াছিলেন। শ্যামাদাসবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া সে শুকাইয়া গিয়াছিল,

হাতজোড় করিয়া সভয়ে সে নিবেদন করিয়াছিল, সে কিছুই জানে না।

শ্যামাদাস অন্য কোন শাস্তি দেন নাই, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, এক মাসের মাইনে তোমার বাকি আছে, সেও তুমি পাবে না।

লোকটা অনেক দিনের পুরানো চাকর, সে আবার কাকুতি করিয়া বলিয়াছিল, আমি কিছু জানি না হুজুর ; তবে বড় বউমা—

কি ?

আজ্ঞে, তিনি একবার চাবি নিয়েছিলেন ঘরের।

বড় বউ চাবি নিয়েছিল ?

হ্যাঁ। আমিই নিয়েছিলাম চাবি। কৃষ্ণভামিনীর বয়স তখন সবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ ; কৃষ্ণভামিনী নির্ভয়ে আসিয়া ক্রুদ্ধ শ্যামাদাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

জরাগ্রস্ত মৃত্যুসমীপবর্ত্তী শ্যামাদাসের চোখের উপর আজও সে মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। সদ্যস্নাতা কৃষ্ণভামিনীর চুল হইতে নখ পর্য্যন্ত সব মনে পড়িল। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণভামিনীর পরনে সেদিন ছিল লালপাড় শাড়ি। আয়ত চোখে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিয়া আজও যেন তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

হ্যাঁ আমিই নিয়েছিলাম চাবি।

তুমি ?

হ্যাঁ। আমিই দুধ দিয়েছি, খাঁচা খুলতে দুটো পালিয়েও গিয়েছে।

তুমি ? তুমি দুধ দিয়েছ ?

হ্যাঁ আমি। বার বারই তো বলছি।

শ্যামাদাস ক্রোধের উপর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভামিনীকে নিত্য নিয়মিত তিনি বিজ্ঞান পড়াইতেন। বিবাহের পর হইতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহার জীবনের সত্যকারের অর্থ কৃষ্ণাকে সঙ্গিনী করিয়া তুলিবার জন্য। অসীম আগ্রহ, কৌতূহল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী তো সবই শুনিতেন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া চক্ষুর অগোচর সৃষ্টিবৈচিত্র্য-রহস্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখিয়া শ্যামাদাসের আনন্দের তৃপ্তির আর অন্ত থাকিত না। সেই কৃষ্ণভামিনী এই কাজ করিয়াছে! এ কথায় তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, এমনই ক'রে অনাহারে তিলে তিলে দগ্ধে তুমি জীবগুলোকে মারবে, শুধু তাই নয়, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাবে, ওদের কাটবে, সে পাপ আমি হতে দেব না—কিছুতেই না।

শ্যামাদাস আর আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন, বাজে ব'কো না কৃষ্ণা, সেন্টিমেণ্টাল ফুলের মত।

সেন্টিমেণ্টাল ফুল? কৃষ্ণভামিনীর আয়ত কালো চোখ দুইটা বিদ্যুৎস্ফুরিত রাত্রির মেঘের মত ঝকমক করিয়া উঠিয়াছিল।

শ্যামাদাস এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আজও তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—জীর্ণ দেহ লইয়াও তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

কে ডাকিল, বাবু!

চাকরটা ডাকিতেছিল, রুগ্ন শ্যামাদাস বলিলেন, বাইরে যা, বাইরে যা তুই।

সেদিনও তিনি কৃষ্ণার মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া চাকরটাকেই সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছিলেন, যা যা, বাইরে যা তুই।

চাকরটা চলিয়া যাইবামাত্র কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, জান তোমার ওই পাপে আমার সংসার শূন্য হয়ে রইল। সন্তান থেকে ভগবান আমায় বঞ্চিত করলেন; আমাকে দিলেন না তিনি। পরমুহূর্ত্তেই বিদুদ্দীর্ণ মেঘের বর্ষণের মত অনর্গল ধারায় কৃষ্ণভামিনীর চোখ হইতে জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

শ্যামাদাস মাথা নীচু করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। এত বড় আঘাত তিনি জীবনে পান নাই। সেদিনের পূর্ব্বেও না, পরেও না। আপন গবেষণাগারে আসিয়া তিনি সেদিন—অর্দ্ধেকটা দিন ক্রমাগত মাথা হেঁট করিয়া পায়চারি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভামিনীর অভিযোগের জন্য নয়; কৃষ্ণভামিনী নিজেই জানিতেন, তাঁহার বন্ধ্যাত্ব তাঁহার নিজের দেহাভ্যন্তরের কোন সূক্ষ্ম ত্রুটির জন্য; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল তিনি বার বার বহু প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। শ্যামাদাসের বিদ্রোহ দুঃখ তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতার জন্য। কৃষ্ণভামিনীকে তিনি সহধর্ম্মিণী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন, সত্যকে অস্বীকার করিলেন। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, সে কথাটি পর্য্যন্ত শ্যামাদাসের মনে পড়িল।

আজও তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মনে হইল, সেদিন বাকি গিনিপিগগুলাকে ছাড়িয়া দিলেই হয়তো ভাল হইত। সেদিনও সে কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল।

রুগ্ন শ্যামাদাসের স্তিমিতদীপ্ত হরিদ্রাভ নিষ্প্রভ চোখ দুইটি ক্ষীণ দীপ্তিতে মুহূর্ত্তের জন্য যেন জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন মুখে তাঁহার এক ক্ষুরধার হাসি খেলিয়া গিয়াছিল। কতবার তিনি কৃষ্ণভামিনীকে বুঝাইয়াছিলেন জীবন-মৃত্যুর অবিরাম দ্বন্দ্বের কথা; জীবন—সৃষ্টির দিন হইতেই অহরহ নিরবধি সে দ্বন্দ্ব চালিয়ে আসিতেছে,—হয় জীবনের বিলুপ্তিতে তাহার সমাপ্তি হইবে, নয় মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া জীবন এ দ্বন্দ্বের মহাকাব্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ টানিবে।

গাঢ় নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শ্যামাদাসের মনশ্চক্ষে সেই অনন্ত মহাদ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল—অণুবীক্ষণের দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়া দেখা ছবি। দেহের অভ্যন্তরে পেশী স্নায়ু অস্থির মধ্যে আপাদমস্তক কোষে অণুকোষে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নিরবধি অবিরাম এক সংগ্রাম। জীবনীমধুরসে টলমল কোষচক্রগুলি মৃত্যুর আক্রমণে জীর্ণ হইয়া ধ্বংস হয়, জীবন আবার করে নূতন সৃষ্টি, জন্মলাভ করে নূতন কোষচক্র।

কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ করা সত্য। অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণভামিনী এ দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্যামাদাস আপনার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার অনুভূতির রাজ্যে কৃষ্ণাভামিনীকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। কৃষ্ণভামিনী তবু তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে—সাধনার ফলকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, আকস্মিক জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য যেমন দুর্ব্বল জীবন গ্রহণ করিতে পারে না। কৃষ্ণভামিনী সেই দিন হইতেই তাঁহার কাছে মরিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণভামিনী—যেন মৃত্যুরূপিনী হইয়া

তাঁহাকে ক্ষয় করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীকে হার মানিতে হইয়াছে। শ্যামাদাস জীবনের একটা দিনও তাঁহার গবেষণায় ক্ষান্ত হন নাই।

না, না। কৃষ্ণাভামিনীও তাঁহার কাছে হার মানেন নাই—কোন দিন না। তিনিও যেমন তাঁহার গবেষণায় ক্ষান্ত হন নাই, কৃষ্ণভামিনীও তেমনই কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্য আপনার স্বতন্ত্র ধর্ম্মসাধনায় বিরত হন নাই।

মনে পড়িল—স্বতন্ত্র শয্যার কথা!

কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, বাড়ি এসে কাপড় যেমন ছাড় তুমি, তেমনই স্নানও করা উচিত!

কেন?

ল্যাবরেটারির ওইসব কাণ্ডের পরে তোমার স্নান করা উচিত নয়? নিজে তুমি অশুচি বোধ কর না?

না।

না নয়, তোমাকে স্নান করতে হবে।

সাবান দিয়ে হাত-পা আমি ধুয়ে থাকি। যতটুকু প্রয়োজন বোধ করি, তার অতিরিক্ত কিছু করব না আমি।

কৃষ্ণভামিনী আর তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু সেই দিনই তাঁহার শয্যা রচনা করিয়াছিলেন খাট ছাড়িয়া মেঝের উপর, ঘরের বিপরীত প্রান্তে।

অথচ একটি দিনের জন্য তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থায় এক বিন্দু ত্রুটি কৃষ্ণভামিনী হইতে দেন নাই। মুর্গীর ডিম, মাংস পর্য্যন্ত নিজের হাতে

তিনি রান্না করিয়া দিতেন। তাহার পর ছিল কৃষ্ণভামিনীর স্নানের নিয়ম।

শ্যামাদাস বিছানায় শুইয়া সদ্যস্নাতা কৃষ্ণভামিনীর দিকে চাহিয়া দেখিতেন; কৃষ্ণভামিনী নিস্পন্দ মূর্ত্তিতে ধ্যান করিতেন।

কৃষ্ণভামিনী তাঁহার কাছে হার মানেন নাই।

অকস্মাৎ শ্যামাদাসের চোখের দৃষ্টি কেমন হইয়া উঠিল। জীবন-মৃত্যু জ্ঞান-বিজ্ঞান সব তিনি যেন ভুলিয়া গেলেন। মনে পড়িয়া গেল এক দিনের কথা। প্রদীপের মিটমিটে আলোক সম্মুখে কৃষ্ণভামিনী সেদিন এক অপরূপ রূপে অসামান্যা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ম্লান আলোর সম্মুখে কৃষ্ণভামিনীকে দেখিয়া শ্যামাদাসের অকস্মাৎ মনে পড়িয়াছিল একটা লাইন—

"Oh she doth teach torches to burn bright!"

শ্যামাদাস বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। শীতের রাত্রি। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল! বৈজ্ঞানিক শ্যামাদাসের শীত গ্রীষ্ম বারো মাস বিছানার পাশের জানালা খোলা থাকে। পাণ্ডুর চাঁদের মরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার তিনি চাহিয়াছিলেন কৃষ্ণভামিনীর দিকে। মনের মধ্যে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিয়াছিল—

"Arise fair sun, and kill the envious moon,

Who is already pale and sick with grief

That thou her maid art far more fair than she."

কৃষ্ণভামিনীর পিঠের উপর এলানো একরাশ ভিজা চুল, ভ্রমরের

বারির মত কোঁকড়ানো কালো চুল; মোমে-মাজা সাদা সুতার মত সিঁথি, মসৃণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছোট কপালটির মধ্যখানে সিঁদুরের টিপ, আধ-মুদিত ডাগর দুইটি চোখ ;—সেদিনের কৃষ্ণভামিনী অসামান্যা।

শ্যামাদাস বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া কৃষ্ণভামিনীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কৃষ্ণভামিনী পদশব্দে বঙ্কিমদৃষ্টিতে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, হুঁ। অর্থাৎ সরিয়া যাও।

না, শ্যামাদাস সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। বাঁ হাতটা মাটির উপর রাখিয়া ডান হাত তিনি প্রসারিত করিয়াই অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঁ হাতে কোন কিছুর স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা চকিত সঙ্কুচন-শিহরণ খেলিয়া গিয়াছিল। হাতের, বুকের, উরুদেশের পেশীগুলি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে খেলিয়া গিয়াছিল, যেন বিদ্যুতের প্রবাহ। আপনাকে সংযত করিয়া শ্যামাদাস হাত তুলিয়া দেখিলেন, তাহার পর চাহিয়া দেখিয়াছিলেন মাটির দিকে। দেখিলেন, হাতের তালুতে আলপিনের মাথার মত এক বিন্দু স্থান সাদা, মাটির উপর ধূপকাটীর মাথার স্তিমিত অগ্নিবিন্দুটিও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিবিয়া গেল।

কৃষ্ণভামিনীও ব্যাপারটা দেখিয়াছিলেন, ধ্যানস্তিমিত মুখেই মৃদু হাসি তাঁহার ঠোঁটের উপর খেলিয়া গিয়াছিল।

শ্যামাদাসের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনিও হাসিয়াছিলেন—ওই সাদা জায়গাটার ভিতরের কোষচক্রটা অগ্নিস্পর্শে মরিয়া গেল, তাহারই অনুভূতি।

আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা আছে। সেটা যেমন ক্ষণিক, তেমনই সেটা প্রচণ্ড।

গিলোটিনে অথবা বন্দুকের গুলিতে বা বজ্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল।

এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি মৃত্যুর কিন্তু বিকৃত রূপ—অকস্মাৎ তপোভঙ্গে বহ্নি-স্ফুরিতনেত্র শিবের রূপের মত। তাহার স্বরূপ শান্ত, গতি ধীর; তিনি নিজে বেশ অনুভব করিতেছেন। লোলচর্ম্ম হাতখানি তুলিয়া তিনি আপনার চোখের সম্মুখে ধরিলেন। পরমূহূর্ত্তেই হাসিলেন। দৃষ্টি অস্বচ্ছ, পরিপূর্ণ পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখে আবরণ পড়িতে শুরু করিয়াছে। হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াও কিছু বুঝা যাইবে না। স্পর্শানুভূতিও ক্ষীণ হইয়াছে; লোলচর্ম্মের অন্তরালে পেশীস্নায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে মৃত্যুর স্পর্শে, পেশীস্নায়ুর মধ্যে কোষ-অণুকোষগুলি বোধ হয় মরণোন্মুখ। ক্রমে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল অসাড় হইয়া পড়িবে, স্মৃতি বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে, সদ্যোজাত শিশুর অস্ফুট অবসাদ-সুখের মত এক আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ বিলুপ্তিতে হইয়া যাইবে সমস্ত কিছুর অবসান।

দুর্গাদাস বড় চীৎকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুটা অনেকটা আকস্মিক; শেষের দিকে মস্তিষ্কের মধ্যে রোগ প্রবেশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র অন্ত্রপ্রদেশের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় নলযন্ত্রটি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, গিলা-করা মসলিনের মত অতি সূক্ষ্ম কুঞ্চিত শ্লৈষ্মিক ত্বকখানি

জীর্ণ করিয়া দুষ্ট ক্ষত উদ্গার করিয়াছিল বিষবাষ্প; সেই বাষ্পাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে সে কি যন্ত্রণা—সে কি দুরন্ত বিকার! কিন্তু বড় মর্ম্মস্পর্শী প্রলাপ বকিয়াছিলেন দুর্গাদাস।

কে বাঁধলে? আমার বাক্স বিছানা কে বাঁধলে?—আঃ—ছি-ছি ছি। আমি যেতে পারব না বলছি। কি বিপদ দেখ দেখি!

কৃষ্ণভামিনীই চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! কি বলছ?

রক্তচক্ষু মেলিয়া দুর্গাদাস তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চিনিয়া বলিয়াছিলেন, বউদি!

কি বলছ?

কিছু না।

ওই যে বাক্স বিছানা ব'লে কি বলছ?

শ্যামাদাস বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়াছিলেন, কেন ওকে বিরক্ত করছ? ডিলিরিয়াম হয়েছে, দেখছ না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা বলছে, আমায় যেতেই হবে। আমি পারব না বলছি। কিছুতেই শুনবে না। আঃ—ছি-ছি-ছি। আমি যাব না। যাব না।

মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অস্ফুট গোঙানির মধ্যেও তিনি বলিয়াছিলেন, না, না, না। আঃ—ছি-ছি-ছি!

রোগ টাইফয়েড শুনিয়া দুর্গাদাস মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়াছিলেন, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব—বিকারের প্রভাবে বিশৃঙ্খল

মন এমনই ভাবেই প্রকাশ করিয়াছিল। বাঁচিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্গাদাসের।

কৃষ্ণভামিনী কি মরিতে চাহিয়াছিলেন? আজও সে প্রশ্নের মীমাংসা শ্যামাদাস করিতে পারেন নাই। মৃত কৃষ্ণভামিনীর মুখ মনে পড়িল—প্রশান্ত হাসিমুখ। কৃষ্ণভামিনীর শবদেহ দেখিয়া সেদিন শ্যামাদাসের বৈজ্ঞানিক তথ্য মনে পড়ে নাই; মনে পড়িয়াছিল রোমিও-জুলিয়েটের কয়েকটা লাইন—

"Death, that hath sucked the honey of thy breath
Hath had no power yet upon thy beauty—
Thou art not conquered"

কৃষ্ণভামিনীর মরণ তাঁহার কাছে আজও বিস্ময়। সংসার সম্পদ সুখ, এ সমস্ত পিছনে ফেলিয়া কেমন করিয়া এমন হাসিমুখে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইলেন তিনি? তাই তাঁহার আজও মনে হয়, গোপন অন্তরে বোধ করি কৃষ্ণভামিনী মরিতে চাহিতেন? তাঁহাকে হয়তো তিনি—। কিন্তু সে কথা শ্যামাদাস মনে মনেও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। রাত্রি বারোটায় কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই নাড়ী কাটিতেছিল; ডাক্তার ইনজেকশন দিলেন, শ্যামাদাস নিজে কৃষ্ণভামিনীর হাতখানি হাতে লইয়া বসিয়াছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন, আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলি ক্রমশঃ হিম হইয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণভামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, পারলে না? বাঁচাতে পারলে না?

বিবর্ণমুখে শ্যামাদাস বসিয়া ছিলেন, হাস্যমুখী কৃষ্ণার এ করুণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই।

মরতে আমার ইচ্ছে ছিল না, তোমাকে রেখে বৈকুণ্ঠে গিয়েও তো আমার শান্তি নেই। কিন্তু কি করব বল?

এবার শ্যামাদাস আত্মসম্বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, বেশি কথা ব'লো না। কি বাজে বকছ!

বাজে? হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, না, বাজে নয়! আমি বুঝতে পারছি।

কেন? কি হয়েছে তোমার?

কি হবে আর? খুব ভাল লাগছে।

সে তো ভাল। ঘুমোও দেখি একটু।

না। তোমার সঙ্গে কথা ব'লে নিই। তোমার কাজ সেরে যেতে কত দেরি, তা তো জানি না। কতদিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পাব না!

শ্যামাদাস অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

না, তুমি এমন করে থেকো না। তোমার মত জ্ঞানী লোক—ছি! আবার তো দেখা হবে দুজনে। নাও, তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার মাথায় দাও। সিঁদুর-কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দাও।

তারপর বলিয়াছিলেন, ছোট বউ কই, ছোট বউ? ডাক, তাকে ডাক।

সদ্যবিধবা দুর্গাদাসের স্ত্রী কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিয়াছিলেন,

আমি তো যাচ্ছি ছোট বউ, ঠাকুরপো সেখানে আছেন, বল,—আমায় ব'লে দে, তোর কি বলবার আছে ব'লে দে।

মৃত্যুর পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে বোধ হয় বিকার অথবা চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল।

অকস্মাৎ কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, ছোট বউ, ছোট বউ, স'রে দাঁড়া, দরজা থেকে স'রে দাঁড়া। আসতে দে।

বাহিরে কেহ ছিল না। শ্যামাদাস ডাকিয়াছিলেন, কৃষ্ণা! কৃষ্ণভামিনী।

ঠাকুর এসেছেন, ঠাকরুণ এসেছেন, মা এসেছেন, বাবা এসেছেন, ছোট বউকে দরজা থেকে স'রে দাঁড়াতে বল।

কি বলছ তুমি।

হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, ভুল বকি নি আমি। আমিও আসব তোমাকে নিতে। দেখো তুমি, ঠিক আসব।

*   *   *   *   *

চিত্তবিভ্রম? হাঁ, চিত্তবিভ্রমই। চিত্তবিভ্রম, দৃষ্টিবিভ্রম।

বার বার আপনাকেই কয়দিন ধরিয়া শ্যামাদাস ওই প্রশ্ন করিলেন, নিজেই ওই উত্তর দিলেন। চিত্তবিভ্রম ঘটে! মৃত্যুর পূর্ব্বের ওটা একটা লক্ষণ। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দে জীবনের ক্ষয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু কোটী বৎসরের বিবর্ত্তন-পথে জীবনের সাধনার সঞ্চয় একে একে ক্ষয় হইয়া লয় হয়। একে একে চৈতন্য, বুদ্ধি, মন, ইচ্ছা, বোধশক্তি—সর্ব্ব অন্তর্লোক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, বাহিরে শ্রীর উপরে পড়ে কালিমা,

শক্তির নিঃশেষে হয় ক্ষয়, পড়িয়া থাকে শুধু দেহ, অবয়ব তাহার মধ্যে পার্থিব উপাদান।

শ্যামাদাসের ঘুম আসিতেছিল!

একটা অতি ক্ষীণ সূক্ষ্ম কিছুর স্পর্শে মৃদু বেদনা অনুভব করিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শীতের শেষরাত্রির কুয়াশাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকের মধ্যে তাঁহার যেন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। কিছুক্ষণ পর ভোর হইল। আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। অস্পষ্ট শব্দ কানে আসিল। কোথায় দূরে কেহ কথা বলিতেছে।

কেমন আছেন?—দূর হইতে কে প্রশ্ন করিল।

চারিদিক চাহিয়া শ্যামাদাস দেখিলেন, পাশে দাঁড়াইয়া কেহ, ক্রমশঃ তাহাকে চিনিলেন, সে ডাক্তার। ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইল, ডাক্তারের হাতে ইন্‌জেকটিং সিরিঞ্জ। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেবেন?

ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি।

বারোটা বাজতে কত দেরি?—বিচিত্র হাসি হাসিয়া শ্যামাদাস প্রশ্ন করিলেন!

ডাক্তার সে কথার উত্তর দিলেন না, বলিলেন, কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার?

কষ্ট? না। তবে—

কি বলুন?

কিছু না।—শ্যামদাস চোখ বন্ধ করিলেন।

স্তিমিত আচ্ছন্ন একাগ্রতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন শ্যামাদাসবাবু। একটা অসীম শূন্যতা। শীতের সন্ধ্যা বোধ হয় হইয়া আসিল। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলিলেন, সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে? চাঁদ ওঠে নি?

আবার বলিলেন, আকাশে তারা ফুটেছে?

আবার কিছুক্ষণ পর বলিলেন, সে আসে নি? সে? সে?

বলিতে বলিতেই তিনি যেন নীরব হইয়া গেলেন। আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিতের মত পড়িয়া রহিলেন। ঘণ্টাখানেকে পর চোখ মেলিয়া চাহিলেন, এবার যেন তিনি অনেকটা আচ্ছন্নতা বিমুক্ত, চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, ডাক্তার?

বলুন।—মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাক্তার উত্তর দিল।

আর দেরি নেই। কিন্তু—

বলুন।

কিন্তু সে কই? সে?

কে?

সে।—শ্যামাদাস ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া খোলা জানালার উজ্জ্বলতর আলোকাভাস অনুভব করিয়া বাহিরের পথে আকাশ অনুসন্ধান করিলেন, চারিদিকে শীতের রাত্রির কুয়াশা, চাঁদটাও যেন অস্তাচলশায়ী, কুয়াশার স্তর অবলম্বন করিয়া অন্ধকার আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অতি ক্ষীণ হতাশকণ্ঠে শ্যামাদাস বলিলেন, সে—সে এল না? আসব বলেছিল, এল না?

ডাক্তার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিলেন, আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, উত্তরও দিলেন না।

তা হ'লে— ?

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

নাথিং মোর ? আর নেই ? সে আর নেই ?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল অধীর হইয়া উঠিলেন। শেষবারে একবার শুধু ডাকিলেন, মা !

স্থির দৃষ্টি, নিষ্পলক চোখ দুইটির চোখের পাতা ডাক্তার হাতের চাপ দিয়া নামাইয়া দিলেন। হাত দুইটি তুলিয়া দেখিলেন, দুই হাতের তালুতে দুই বিন্দু জল।
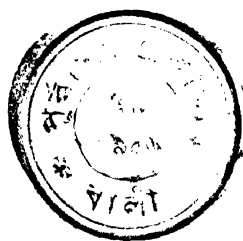
সনাতন

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, রোগটা কি?

ননীবাবু প্রবীণ চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা বংশগত বিদ্যা, তিন পুরুষ ধরিয়া এ বংশের প্রত্যেকেই চিকিৎসক হিসাবে শুধু জীবিকাই নয়, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। এই বিদ্যার সঙ্গে ইহাদের একটা যেন জন্মগত পরিচয় আছে। বাড়ির মেয়েরা পর্য্যন্ত নাড়ী দেখিতে জানে, আকস্মিক আপদে-বিপদে দুই-চারিটা টোটকার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহারা দিয়া থাকে। ননী ডাক্তার কবিরাজি এবং ডাক্তারি দুই জানেন, ধীর গম্ভীর লোক, এ অঞ্চলে লোকে বলে—ধন্বন্তরি। অবশ্য ননী ডাক্তারের হাতে সকল রোগীই যে বাঁচে তাহা নয়, তবে ননীবাবু ভুল করেন না; ক্ষেত্রবিশেষে সসম্ভ্রমে মৃত্যুকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান।

ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, রোগটা? কালরোগ, আর কি?

কালরোগ।

হ্যাঁ। বয়স যে অনেক। পঁচাশির কম নয়। কাল—মানে বয়সই এখন ব্যাধি। ননীবাবু আবার একটু হাসিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

শিবনাথদের বাড়ির চার পুরুষের চাকর।

শিবনাথের প্রপিতামহের আমলে এ বাড়িতে বহাল হইয়াছিল। দশ বছর বয়সের হাড়ীর ছেলে, মোটাসোটা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একমাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ গঠন; গরুর রাখালি করিবার জন্য বহাল হইয়াছিল। নাম সনাতন, কিন্তু মোটাসোটা চেহারার জন্য কর্ত্তা নাম দিয়াছিলেন, কুমড়ো।

ছোট ছোট চোখে অনেকক্ষণ কর্ত্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, বাবু মশায়! কত্তাবাবু!

কি রে?

কর্ত্তার পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা কুমড়োর মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল; অদ্ভুত, বিস্ময়কর, দুর্ব্বোধ্য! কুমড়ো বিহ্বল করুণ ভাবে সভয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমাকে মারবা না কত্তাবাবু?

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও সস্নেহে হাসিয়া কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, না, মারব কেন?

ঘরের ভেতর ভ'রে রাখবা না?

না, না। বরং ভাল ক'রে কাজ করলে বকশিশ দেব।

বকশিশ দেবা? কি দেবা?

কি নিবি?—কর্ত্তা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

চাপরাসীর লাল শালুর পাগড়িটা দেখাইয়া কুমড়ো বলিয়াছিল, অমুনি লাল টুপি একটো আমাকে দিও।

ঠিক সেই সময়েই বাড়ির ঝি আসিয়া কর্ত্তাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে

ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে, জানাইয়াছিল, বাজার যাইবার জন্য লোকের প্রয়োজন, লবঙ্গের অভাব পড়িয়াছে, পান সাজা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চাকরটা কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, চাপরাসীরও কার্য্যভার লইয়া বাহিরে যাওয়ার কথা, কর্ত্তা কুমড়োকেই পাঠাইয়াছিলেন, লবঙ্গ নিয়ে আয় চার পয়সার, বুঝলি ?

কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা হাতে কুমড়ো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়াছিল, এই ল্যান গো।

ঠোঙায় একঠোঙা নুন।

বাড়িতে হাসির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল! গিন্নী সেবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, খেতে ঝাল-ঝাল লাগে, লবঙ্গ, লবণ নয় বুঝলি ? লঙ্গ। লঙ্গ।

দ্বিতীয় বারে আরও একটা বড় ঠোঙা হাতে কুমড়ো ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার ঠোঙায় এক ঠোঙা লঙ্কা।

সেবার আর হাসির ধ্বনি বাড়ির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কাছারি-বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল ; কুমড়ো বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, বললা যি, ঝাল !

কর্ত্তার খড়ম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এত উচ্চ হাসির জন্য বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া উচ্চ হাসিতে তিনি গোটা পাড়াখানা সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর পরেও সনাতনের সে কথা এ বাড়িতে সকলেই জানে ; পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আরও একটা কথা—সেই প্রথম দিনেরই কথা—বাঁচিয়া আছে। বাড়ির গরু বাছুর

গোয়ালে বন্ধ করিয়া, সনাতন বাড়ি যাইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া সরবে কাঁদিয়াছিল, ও—মা গো! ওগো—মা গো!

কর্ত্তা নিজে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কে মেরেছ?

হাতের মুঠায় চোখ মুছিতে মুছিতে কুমড়ো বলিয়াছিল, 'আনার' হয়ে যেল যি!

কি?

আঁদার।

আঁধার!

হ্যাঁ। আমি কি ক'রে বাড়ি যাব? 'মোলকিনী' পুকুরের পাড়ে ভূত আছে যি! ভাগাড়ে গো-দানা আছে গো!

কর্ত্তা হাসিয়া চাপরাসী সঙ্গে দিয়া কুমড়োকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতনের সঙ্গে সে কথা আজও বাঁচিয়া আছে। সে তাহার দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য ভূতের আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছে।

শুধু ভূত নয়, দেবস্থান এবং দেবতাকেও তাহার ভয় ছিল বিষম, সে ভয় আজও তাহার যায় নাই। আর একটা নূতন ভয় তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইল চাকরির কয়েক দিন পরেই।

বড়বাবু অর্থাৎ কর্ত্তাবাবুর বড় ছেলে শিবনাথের পিতামহ কাছারিতে বসিয়া একজন প্রজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন; মাতব্বর প্রজাটি কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ফেলিল। কুমড়ো কয়েক আঁটি খড় লইয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা না বুঝিলেও ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা গুপ্ত বহ্নির

উত্তাপের মত তাহাকে স্পর্শ করিল। বড়বাবুর থমথমে মুখ, মোড়ল মহাশয়ের সোজা বসিবার ভঙ্গি এবং সতেজ কণ্ঠস্বর তাহাকেও উত্তেজিত এবং কৌতূহলী করিয়া তুলিল। সকল কথা মনে নাই, কিন্তু ঘটনাটার শেষ দুইটা কথা সনাতনের বার্দ্ধক্যজনিত বধির কানে আজও বাজে—পারবে না?

সমান তেজে প্রজাটি উত্তর দিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর এক লাথিতে এত বড় মানুষটা উল্টাইয়া দাওয়া হইতে একেবারে নীচে আসিয়া পড়িল।

কুমড়োর সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পলাইয়া আসিল। বড়বাবুর প্রতি দুরন্ত একটা ভয় তাহার বুকে চিরদিনের মত বাসা বাঁধিয়া বসিল। দীর্ঘ দিন চাকরির মধ্যে সে ভয় তাহার আর যায় নাই।

এই কয়টি ভয় বাদ দিয়া কিন্তু সনাতনের দুর্দ্দান্ত সাহস। বাবুদের 'উদাসীর ডাঙা'য় বিস্তীর্ণ জঙ্গলাবৃত প্রান্তরে গো-চারণের মাঠ—সেখানে গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া সাপ যথেষ্ট। গো-চারণের ছোট পাচনি লাঠি ও ঢেলার সাহায্যে কত সাপ যে সে মারিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। শুধু মারাই নয়, সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে নিজেই সাপকে বন্দী করার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। নেকড়ে জাতীয় হিংস্র হেঁড়োলের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া হেঁড়োলের বাচ্চাও সে ধরিয়া আনিয়াছে। একবার বড় একটা নেকড়ে একটা বাছুর আক্রমণ করিয়াছিল; তখন অবশ্য কুমড়ো আর কুমড়ো নয়, সে তখন আঠারো-উনিশ বছরের কাঁচা জোয়ান; দৈর্ঘ্যে প্রায় সাধারণ মানুষের হাতের সওয়া

চার হাত অর্থাৎ ছয় ফিটেরও বেশী। পাচনটা লইয়াই সে নেকড়েটার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নেকড়েটার টুঁটির উপর যখন সে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত। সে ক্ষতচিহ্ন তাহার লোলচর্ম্ম দেহে আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

জানোয়ারটাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া আসিল। চামড়াটা ছাড়াইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মনিব-বাড়ির চাপরাসীটা সেটাকে লইয়া গিয়া হাজির করিল কাছারিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক পড়িল।

কর্ত্তাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন, বেটা অসুর! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন নায়েবকে, বেটাকে একটা পাগড়ি কিনে দাও তো। আমার মনে আছে, প্রথম দিনই বেটা আমার কাছে লাল পাগড়ি চেয়েছিল।

বড়বাবু গম্ভীরভাবে হুকুম দিলেন, আগে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাক, যে রকম কেটে গেছে, আর নেকড়ে-টেকড়ের দাঁতে বিষ আছে শুনেছি।

সনাতন প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া আড়াল পড়িতেই একেবারে সোজা দৌড় মারিল। বাপ রে! ডাক্তার ছুরি চালাইয়া দিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে ন্যাকড়ার ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিবে, বাপ রে! পলাইয়া আসিয়া সে একেবারে গোয়ালঘরের মাচায় উঠিয়া বসিয়া রহিল। চাপরাসীটা বার দুয়েক ডাকিয়া ফিরিয়া গেল। পাখির কলরবে সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া মাচা হইতে চুপি চুপি নামিয়া গরুগুলাকে গোয়ালে পুরিয়া দিয়া বাড়ী পলাইল। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া

আসিয়াছে, সম্মুখে মোলকিনী পুকুরের পাড়ের বটগাছটায় ভূত আছে। ঝাঁকড়া অন্ধকার বটগাছটার পাশেই বাঁশের ঝাড়, ভূত বাঁশ হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া থাকে, কেহ সেটাকে পার হইতে গেলেই তড়াক করিয়া বাঁশটা সোজা উপরে উঠিয়া যায়; বাঁশের সঙ্গে মানুষটাও ওই উপরে উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া মরে। শতেক ছলনা ভূতের, ভাদ্র মাসে পাকা তাল হইয়া গাছ হইতে একেবারে নির্ঘাত ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। কখনও বা হঠাৎ একেবারে তালগাছের মত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া পথের উপর দাঁড়ায়। এই তালগাছের মত মূর্ত্তিকেই সনাতনের বেশি ভয়। কিন্তু উপায়ই বা কি? এ পথে তো তাহাদের জাতি-জ্ঞাতি ছাড়া বড় কেহ যায় না। আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ এই অংশটা পার হইয়া তবে তাহাদের পল্লী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সনাতন কাহারও সঙ্গ পাইল না। তাহাদের অন্য সকলে এতক্ষণে বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজতলার বটগাছটির নীচে ঢোল লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বৈশাখে বোলান গান, জ্যৈষ্ঠের পাঁচালি, আষাঢ়ে পঞ্চমী হইতে নাগপঞ্চমী পর্য্যন্ত মনসার ভাসান, ভাদ্রে ভাদু, আশ্বিন হইতে ফাল্‌গুন পর্য্যন্ত পাঁচমিশালী, চৈত্রে ঘেঁটু। সনাতন নিজে গান গাহিতে পারে না। কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু উৎসাহ তাহার প্রবল। কোনরূপে সে বুক বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক করিল, বটগাছতলাটার আগে হইতেই সে চোখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মোলকিনীর পাড়ে আসিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিন্তু চোখ সে আপনার অজ্ঞাতসারেই বার বার খুলিয়া ফেলিতেছিল।

ও কে ? বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকি দিয়া কেহ হৃৎপিণ্ডটাকে কুটিতেছে! সাদা-কাপড়-পরা ছোট আকারের ও কে ওখানে ঘুরিতেছে! সে অদ্ভুত একটা বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে? মূর্ত্তিটা এতক্ষণ তাহাকে বোধ হয় দেখে নাই, তাহার অদ্ভুত বিকৃত স্বরের সাড়ায় এবার সে ঘুরিয়া খানিক আগাইয়া আসিয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। সনাতনের চেতনা লোপ পাইতেছিল, প্রাণপণে সে চেতনাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিল।

মূর্ত্তিটা আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া নাকী সুরে বলিল, আমি ভূত। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবার সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে একটা অতি উত্তেজনাময় উষ্ণ চেতনার প্রবাহ ভয়ের হিমশীতল অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ চমকের মত খেলিয়া গেল।

নন্দ। ভূত নয়, নন্দরাণী—তাহাদেরই সেই ডাকাবুকো মেয়েটা—কষ্টিপাথরের মত কালো, শ্যাওলার মত নরম—সেই মেয়েটা! ভয় সনাতনের কোথায় চলিয়া গেল, সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; বিপুল উত্তেজনাময় উল্লাসে সেও হো-হো করিয়া হাসিয়া নন্দর দিকে ছুটিল। মুহূর্ত্তে মেয়েটাও ছুটিল। সুদীর্ঘ সনাতন, আর নন্দ ছোটখাটো মেয়েটি, সে কতক্ষণ তাহার আগে আগে ছুটিবে! সনাতন লম্বা হাত বাড়াইল। কিন্তু অদ্ভুত কৌশল মেয়েটার—চট করিয়া পাশ কাটাইয়া এমন মোড় ফিরিল যে, সনাতন শূন্য হাত বাড়াইয়া গতির আবেগে চলিয়া গেল—নন্দ অন্য দিকে সরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। এমনই একবার নয়, বার বার। ভাদ্রমাসের অন্ধকার সে হাসিতে যেন

শিহরিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে নন্দকে সে যখন ধরিল, তখন নন্দ এলাইয়া পড়িয়াছে। সনাতনও হাঁপাইতেছিল। তবুও সে শিশুর মত নন্দর ছোট দেহখানি দুই হাতে তাহার মাথার উপরে তুলিয়া বলিল, দি, ফেলে দি আছিড়ে ?

সুকৌশলে ঈষৎ ঝুঁকিয়া নন্দ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কই, দে দেখি !

ভাদ্র-সন্ধ্যায় নন্দ তালের খোঁজে আসিয়াছিল।

এই নন্দকেই সে বিবাহ করিল। সেও একটা কাণ্ড। নন্দর বাপ পণের দাবি করিল অনেক—এক কুড়ি পাঁচ টাকা।

পরের দিন নন্দকে আর পাওয়া গেল না। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার ; সনাতন কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে মনিব-বাড়িতে কাজ করিতেছিল। যাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে থানা-পুলিসকে লোকে এড়াইয়াই চলিত, আইন-কানুনও জানিত না। নন্দর বাপ-মা বড়বাবুর কাছে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বড়বাবু কড়া লোক, সূক্ষ্ম বিচারক ; কর্ত্তাবাবুর সবতাতেই হাসি।

আজ্ঞে হুজুর, ওই—ওই শালারই কাজ।

বড়বাবু হুকুম দিলেন, ডাক তো বেটাকে। কিন্তু সনাতন তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চাপরাসীটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে, কোথাও পেলাম না।

সবিস্ময়ে বড়বাবু বলিলেন, আরে, এই তো ছিল !

একান্ত নিরুপায় ভঙ্গিতে চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম।

ঠিক এই সময়ে কর্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, সে বেটা অসুর গেল কোথায় ?

এই ছিল, কিন্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্তাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ির বাগানের গাছগুলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন গোয়াল-বাড়ির দিকে। সেখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, গোয়াল-ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, এই ব্যাটা অসুর।

গোয়ালের মাচার উপরে খসখস শব্দ হইতেছিল, শব্দটা থামিয়া গেল।

এবার ঈষৎ কঠোর স্বরে ডাকিলেন; সনাতনে !

মাচার উপর হইতে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সনাতন দাঁড়াইল।

কর্তা আবার একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই হারামজাদী হাড়িনী, নাম মাচা থেকে।

বিড়ালীর মত কড়িকাঠ আঁকড়াইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে এবার নন্দ লাফাইয়া নামিল।

কর্তা বলিলেন, আয়।

নিঃশব্দে পোষা জানোয়ারের মত কর্তাবাবুর পিছনে পিছনে কাছারিতে আসিতেই নন্দর বাপ-মা দারুণ ক্রোধে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। বড়বাবুর চোখ দুইটাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে সনাতন যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল। কর্তাবাবু গম্ভীর স্বরে নন্দর

বাপ-মাকে বলিলেন, চেঁচাস নি। তারপর নায়েবকে বলিলেন, পঁচিশটা টাকা আমাকে দাও তো।

বড়বাবু প্রশ্ন করিলেন, আজ্ঞে?

পঁচিশটা টাকা। কর্ত্তাবাবু নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বিনা বাক্যব্যয়ে পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দিল। কর্ত্তাবাবু নন্দর বাপকে ডাকিয়া বলিলেন, নে, গুনে নে। আজ রাত্রেই বিয়ে দিতে হবে, বুঝলি?

বিবাহের পর সনাতন গোল বাধাইল। যে সনাতন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনিব বাড়িতে পড়িয়া থাকিত, সেই সনাতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ি পলাইতে আরম্ভ করিল। সনাতন এই আছে, এই নাই। শুধু তাই নয়, সেদিন চাপরাসীটা সনাতনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সনাতন তাহাকে বেশ ঘা-কতক লাগাইয়া দিল। ইহার পর তিন চার জন চাপরাসী গিয়া সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া আসিল। বড়বাবু তাহাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কর্ত্তাবাবু কি সুনজরেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি সে দণ্ড মাপ করিয়া বলিলেন, দে, নাকে খত দে বেটা শুয়ার।

মাটির উপরে নাক ঘষিয়া সনাতন চামড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিল। রক্তাক্ত নাকটা দেখিয়া এবার বড়বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, খবরদার, এমন কাজ আর যেন করবি না।

সনাতন কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমি ছেলাম না বাড়িতে, প্যায়দা কেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছিল মশায়?

বড়বাবু এবার কঠিন দৃষ্টিতে চাপরাসীটার দিকে চাহিলেন। কর্ত্তাবাবু

বিচিত্র মানুষ, তিনি এক কথায় ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া বলিলেন, তোর বউকেও আজ থেকে কাজ করতে হবে এখানে, বুঝলি? সকালবেলা থেকে খোকাকে নিয়ে থাকবে। আর দুপুরবেলায় তুই গরু নিয়ে যাবি মাঠে, ঝুড়ি নিয়ে বউ যাবে তোর সঙ্গে, গোবর কুড়িয়ে মাঠে জড়ো করবে। বুঝলি? দুবেলা খেতে পাবে, বছরে পূজোর সময় একখানা কাপড়!

সনাতন উল্লাসে যে কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। গোয়ালবাড়িতে আসিয়া বড় মহিষটার গলা ধরিয়া দশটা চুমা খাইল, খানিকটা নাচিল, ভেড়ার পালের মেড়াটার সঙ্গে ঢুঁ খেলিয়া উপর-হাতের পেশীতে কালসিটে পড়াইয়া ফেলিল। আঃ কর্ত্তাবাবুকে কাঁধে করিয়া সে যদি নাচিতে পাইত! অথবা বাবুর পায়ের তলাটা যদি জিব দিয়া চাটিতে পাইত! সে ছুটিয়া গিয়া নন্দকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

অতর্কিত আকর্ষণে নন্দ বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সনাতন সে গ্রাহ্যই করিল না।

ইহার পর নন্দ সকাল হইতে বড়বাবুর খোকাকে—শিবনাথের বাপকে লইয়া বসিয়া থাকিত, খেলা দিত। সনাতন কাজ করিত, মধ্যে মধ্যে খোকাকে কাঁধে লইয়া নাচিত, কখনও কখনও খোকার পিঠে মৃদু মৃদু কিল চড় মারিত, কান মলিয়া দিত, বলিত, দু-চার ঘা মেরে রাখি নন্দ, বড় হ'লে তখন তো চোখ লাল করবে, দেবে কষে জুতোর বাড়ি।

নন্দ হাসিত মৃদু হাসি, সনাতনের হাসি অট্টহাসি।

দুপুরে নির্জ্জন উদাসীর প্রান্তরে সনাতন বটগাছতলায় বসিয়া থাকিত; নন্দ তাহার পাচনি লাঠিটা লইয়া গরু-মহিষগুলাকে আগলাইয়া ফিরিত। লাঠি হাতে নন্দকে এমন সুন্দর মানাইত! খাটো মোটা

কাপড় পরা, মাথায় খাটো নন্দর হাতে সনাতনের লাঠিগাছটা নন্দর মাথার উপরেও খানিকটা উঠিয়া থাকিত। নন্দ নির্ভয়ে প্রকাণ্ড কালো মহিষ দুইটাকে দুমদাম করিয়া পিটিত। কখনও কখনও সে সুকৌশলে উঠিয়া বসিত মহিষের পিঠে, মহিষটা চলিত, নন্দ এমন দুলিত সেই চলার সঙ্গে সঙ্গে যে, সনাতনও ছুটিয়া গিয়া চড়িয়া বসিত অন্য মহিষটার পিঠে।

মহিষের পিঠের উপর হইতেই নন্দ প্রথম দিনই চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ !, আলান !

প্রকাণ্ড বড় এক আলান—অর্থাৎ আল কেউটে চলিয়া যাইতেছিল, নন্দর চীৎকারে সেটা অল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দেখিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিয়া বলিল, ওর নাম কালকুটি, কিচ্ছু বলে না বুড়ী। বুঝলি, ওকে যেন মারতে-টারতে যাস না। তারপর সে হাতে তালি দিয়া বলিল, যা যা বুড়ী, চলে যা।

সাপটা আর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সনাতন এখানকার কীট-পতঙ্গটিকেও চেনে। ওই প্রকাণ্ড বড় কেউটেটার রীতিনীতি, গতিবিধি সব তাহার সুবিদিত, এমন কি কালকুটির গর্ত্তটাও সে চেনে। কালকুটির বহু শাবককে সে হত্যা করিয়াছে। সেগুলার স্বভাব মায়ের মত নয়। সনাতন জানে, বয়স হইলে উহারাও এমনই ধীর স্থির হইবে, কিন্তু বয়স হইতে হইতে যে কত জীবজন্তু মানুষ মারিবে তাহার কি ঠিক আছে? আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই সে সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গর্ত্তটার আশেপাশে। সহসা একদিন দেখা যায়, কালো কালো সর্পশিশুতে চারিপাশ ভরিয়া গিয়াছে।

সাপের ডিম, গরম-খোলায়-দেওয়া ধান হইতে খইয়ের মত ফোটে যে! ডিম ফাটিয়া ছটকাইয়া বাহির হয় সাপের বাচ্ছা। নহিলে উহাদের মা ওই কালকুটিই যে খাইয়া ফেলিবে উহাদের। গর্ত্তের ভিতরে উদ্যত গ্রাসে বসিয়া থাকে কালকুটি, উপরে থাকে সনাতন লাঠি লইয়া। তবুও যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহার বড় হইয়াও প্রাণ দেয় সনাতনের হাতে।

নন্দ সেদিন কালকুটিকে চিনিল, ক্রমে ক্রমে আরও অনেককে চিনিল, কত নূতনকে আবিষ্কার করিল, প্রজাপতির ডিম সনাতন চিনিত না, সে জানিত সেগুলা মরা কাচপোকা, নন্দ সনাতনকে চিনাইয়া দিল। দুইজনে মিলিয়া গোবর কুড়াইয়া বানাইয়া তুলিল প্রায় একটি পাহাড়।

কর্ত্তাবাবু খুশি হইয়া গোটা একটা টাকা বকশিশ দিলেন। সনাতন সেদিন নন্দকে আদর করিল, তু আমার আনার ঘরের আলো।

নন্দ অবাক হইয়া গেল।

সনাতন সেই দিনই কথাটা শিখিয়াছে বড়বাবুর কাছে। পূজার কাপড়ের প্রকাণ্ড গাঁটরি মাথায় সনাতন বড়বাবুর সঙ্গে বাড়ির ভিতর গিয়াছিল। বড়গিন্নী অন্ধকার বড় ঘরের দরজা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, দাঁড়াও, আলো জেলে দিই।

বড়বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, দরকার নেই, তুমি আমার আঁধার ঘরের আলো!

কথাটা সনাতনের বড় ভাল লাগিয়াছে।

* * * * *

বছর দশেক পরে সেই নন্দ একদিন সনাতনকে ছাড়িয়া চলিয়া

গেল, সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িল। সনাতনের সে অবস্থা বর্ণনার অতীত; কর্কশ উচ্চকণ্ঠের কুণ্ঠাহীন আর্ত্ত চীৎকারে সমস্ত গ্রামখানাকে নিশীথরাত্রে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কর্ত্তাবাবু তখন মারা গিয়াছেন, বড়বাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন, সেই লোকের সঙ্গে শিবনাথের বাবাও গিয়াছিলেন। সনাতনকে তিনি বড় ভালবাসেন, সে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে। শবদেহের পাশে একটি কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, উঠানে সে আলো বিশেষ আসিয়া পড়ে নাই, অন্ধকার উঠানে অসুরের মত প্রশস্ত প্রকাণ্ড বুকে বাঘের থাবার মত হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে সনাতন।

সৎকার করিয়া পরদিন সে যখন মনিব বাড়িতে আসিল, তখন চোখ দুইটা তাহার কুঁচের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভাবিল, সনাতন পাগল হইয়া যাইবে।

সেইদিন গভীর রাত্রে সে যখন ছুটিয়া আসিয়া কাছারির দাওয়ার চাপরাসীটার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল, তখন পাগল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া চাপরাসীটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সনাতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, নন্দ, প্যায়দা, নন্দ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াইছে।

মাস-খানেক পরেই একদিন সকালে চাপরাসীটা বলিল, সনাতন আসে নাই।

বড়বাবু বলিলেন ডেকে নিয়ে আয়!

চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে রাত্রে উঠে সে কোথা চলে গিয়েছে।

এইখানে আমার কাছেই তো শোয় এখন, ভোররাত্রে উঠে গেল, তারপর আর আসে নাই।

কড়া মেজাজের মানুষ বড়বাবুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।—নন্দর শোকে সনাতন দেশত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু পরের দিনই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

চাপরাসীটা প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি ?

সনাতন জবাব দিল, গেয়েছিলাম যেথানে মন হয়েছিল।

আবার দিন দুই পরে দেখা গেল, সনাতন নাই। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সে নিখোঁজ। যে সনাতন নন্দর প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ধ্যাতেই ভয়কাতর শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়ে, সে রাত্রির অন্ধকারেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে !

চার দিন পরে সে ফিরিল। বড়বাবু এবার রুষ্টভাবেই বলিলেন, এমন করবি তো কাজে জবাব দে। সন্ন্যাসী হতে চাস তো সন্ন্যাসীই হয়ে যা। আর নয় তো আবার বিয়ে-থা করে ঘরসংসার কর, কাজকর্ম্ম কর।

সনাতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু বলিলেন, কি বলছিস ?

নখ দিয়া দেওয়াল খুঁটিতে খুঁটিতে সনাতন বলিল, আজ্ঞে—

বুঝলি আমার কথা ?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সনাতন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। একেবারে সটান অন্দরে আসিয়া বড়গিন্নীর সম্মুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

দু কুড়ি টাকা আপনি গ্যান। লইলে বড়বাবুকে বলে গ্যান।

বড়গিন্নী সবিস্ময়ে বলিলেন, দু কুড়ি টাকা নিয়ে কি করবি তুই? তীর্থ যাবি নাকি?

সনাতন মাথা চুলকাইয়া বলিল, বড়বাবু বলছেন বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে?—সস্নেহে হাসিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, ভালই বলেছেন রে! মরণকে ঠেকিয়ে তো সংসার করা যায় না বাবা, তার জন্যে বিরাগী হলে কি চলে?

পরম আগ্রহে সম্মতি জানাইয়া সনাতন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুশি হইয়াই গিন্নী বলিলেন, বেশ, কনে ঠিক কর, টাকার জন্যে বলব আমি বড়বাবুকে।

আজ্ঞে, কনে আমি ঠিক করেছি, টাকা হলেই হয়।

বাড়ির মেয়েরা বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া উঠিল, ও মাগো!

কোথায় রে কোথায়? কবে ঠিক করলি রে এর মধ্যে?

কেমন কনে রে? কত বড়? দেখতে কেমন?

সনাতন বসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পুলকিত লজ্জার সহিত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল।

মেয়েটির বাড়ি ক্রোশ খানেকের মধ্যেই—যুগলপুরে। অনেক দিন হইতেই সনাতন চেনে। হাটে সে নিয়মিত আসে। সনাতন বলিল, কনে আজ্ঞে ভারী সোন্দর। আর বয়েস তা খানিক হবে বইকি!

সনাতন বর্ণনায় অতিরঞ্জন করে নাই। মেয়েটি সত্যই সুন্দর দেখিতে। বর্ণে সে গৌরী, মুখশ্রীতে লাবণ্যময়ী, কেবল চোখ দুইটি খয়রা রঙের, গঠনে সে দীর্ঘাঙ্গী, বয়সে বাইশ চব্বিশ। সনাতন

বৈরাগ্যের বশে মধ্যে মধ্যে নিখোঁজ হয় নাই, মেয়েটির প্রেমের আকর্ষণেই সেখানে ছুটিয়া গিয়া পড়িতেছিল। মেয়েটী সধবা। অনেক কাণ্ডের পর তাহার স্বামী দুই কুড়ি টাকার বিনিময়ে তাহাকে ছাড়পত্র দিতে রাজী হইয়াছে। সেদিন রাত্রে তাহাদের দুইজনকে একত্র পাকড়াও করিয়া সনাতনকে তাহারা দুরন্ত প্রহার দিয়াছিল। সনাতন সে গ্রাহ্য করে নাই, মার খাইয়াও স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে ছেড়ে দিস তো দে, লইলে আমি নিয়ে পালাব। শুধো কেনে ওকে—উ-ও থাকবে না তোর কাছে।

মেয়েটার লজ্জার আবরণ নিঃশেষে খসিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মার খাইয়া সে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল, আজই যাব আমি উয়োর সঙ্গে।

শেষ পর্য্যন্ত কুড়ি টাকায় সনাতন রফা করিয়া আসিয়াছে।

*　　*　　*　　*

আবার সনাতন ঘর বাঁধিল, সংসার পাতিল। নিজের ঘর ছাড়িয়া সে নূতন ঘর তৈরি করিল বাবুদের গোয়াল-বাড়ির পাশেই। পুরানো বাড়িতে নন্দ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন দিন রাত্রে কড়িকাঠে বসিয়া সে যদি তালগাছের মত মোটা পা বাহির করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে চাপাইয়া দেয়, তবে—! ঝাঁকড়া চুল ভর্ত্তি মাথাটা বারবার নাড়িয়া সনাতন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। তাই সে নূতন করিয়া ঘর গড়িল—সে ঘরে নন্দর এতটুকু জিনিসও সে রাখিল না, আপনার সামগ্রীর লোভে নন্দ যে নিশ্চয় এখানে আসিয়া হাজির হইবে।

নূতন বউয়ের নামটিও বড় ভাল, পেরভাতী, অর্থাৎ প্রভাতী। মেয়েটি কিন্তু বিলাসিনী। চলনে-বলনে, আচারে-রুচিতে, পোশাকে-প্রসাধনে সনাতনের বিপরীত। মেয়েটি চলে হেলিয়া দুলিয়া, কথা কহিতে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে, পোড়ানো সামগ্রী তাহার মুখে রোচে না, সে পান খায়, দোক্তা খায়, কাপড় পরে পা ঢাকিয়া পরিপাটী ছাঁদে, চুল বাঁধে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত 'আলবোট' কাটিয়া। অথচ সনাতন ভালবাসে পোঁড়ান জিনিস খাইতে, সে ভালবাসে খাটো মোটা কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরিতে, রুক্ষ চুল টানিয়া মাথার উপর ঝুঁটি-খোঁপা তাহার সবচেয়ে ভাল লাগে। নন্দর মত গোবর প্রভাতী কুড়াইবে না। ছেলের ঝি হইতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাবুদের বাড়িতে শিশু ছেলেও কেহ নাই।

তবুও সনাতন অবনত মস্তকে মন্ত্রমুগ্ধের মত পেরভাতীর আনুগত্য স্বীকার করিল। প্রভাতীর মনোরঞ্জনের জন্য এখানে ওখানে সে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মনিব-বাড়ির কাজের উপর আর একটা কাজ লইল; ও পাড়ার হীরু চাটুজ্জে বিদেশে চাকরি করে, এবার সে মেয়েছেলে লইয়া গিয়াছে, রাত্রে তাহার বাড়িতে পাহারা দিবার কাজ লইল সনাতন। প্রভাতীকে সঙ্গে লইয়া সে সন্ধ্যার পর চাটুজ্জে বাড়ি যাইত। আবার ভোরবেলায় উঠিয়া চলিয়া আসিত।

মাস কয়েক পর—

সেদিন পেরভাতী কোন ভদ্রলোকের বধূ বা কন্যার পরনের শাড়ি দেখিয়া বলিল, ওই শাড়ি আমার চাই।

সনাতন মাথায় হাত দিয়া বসিল। মনিব-বাড়িতে বিবাহের ঋণ

জমিয়া আছে, এখানে ওখানে যে ঋণ করিয়াছে সেও শোধ হয় নাই, এখন টাকা কোথায় মিলিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আসিল ছোটবাবু অর্থাৎ শিবনাথের বাপের কাছে। ছোটবাবুকে নন্দ ও সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, আর ছোটবাবু এখনও পুরা বাবু হইয়া উঠে নাই, জুতা মারিবার বয়স হয় নাই, সনাতন ছোটবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে টিপিতে সলজ্জভাবেই কথাটা ব্যক্ত করিল।

ছোটবাবুও একটু লজ্জিত হইলেন, টাকা তো আমার কাছে নেই সনাতন।

গিন্নীমাকে চাও। লয়তো বউরাণীর কাছে লাও। আমাকে কিন্তুক দিতে হবে ছোটবাবু। ছোটবাবুর তখন বিবাহ হইয়াছে, দশ-এগারো বছরের বধূ।

আচ্ছা, কাল বলব তোকে।

সনাতন খুশী হইয়া আসিয়া পেরভাতীকে বলিল, কাল।

পরদিন সকালেই ছোটবাবু টাকা লইয়া গিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সনাতন বসিয়া আছে, তাহার সে মূর্ত্তি অদ্ভুত। চোখ দুইটা রাঙা, মুখখানা ভীষণ, আর প্রভাতী দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে উপুড় হইয়া অসম্বৃত বেশে অনাবৃত গৌরবর্ণ পিঠখানায় প্রহার-চিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়াছে। ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে সনাতন?

সনাতন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আজ আধ-মরা ক'রে ছেড়েছি, এক-দিন কিন্তুক নিদ্দম মেরে ফেলাব ছোটবাবু।

প্রভাতীর পিঠের প্রহার চিহ্নগুলি দেখিয়া ছোটবাবু সনাতনকেই তিরস্কার করিলেন, ছিঃ, এমনই ক'রেই কি মারে রে!

প্রভাতী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, সনাতন গর্জ্জন করিয়া বলিল, রেতের বেলায় চাটুজ্জের বাড়িতে আমাকে একখানা বস্তা দিয়ে বলে কি, বাথার থেকে ধান বার ক'রে লে। আমি চুরি করব ছোটবাবু!

ছোটবাবুর মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা। তাঁহাদের বাড়ির আমগাছটায় আম পাকিত সকল গাছের আগে। যতটি আম গাছ হইতে পড়িত সনাতন কুড়াইয়া বাড়িতে দিয়া আসিত, কখনও তিনি সনাতনকে কুড়াইয়া লইয়া আম খাইতে দেখেন নাই। একবার তিনি চাহিয়াছিলেন একটা আম। সনাতন বলিয়াছিল, বাড়িতে লেবা।

ছোটবাবু কাপড়ের টাকা দিতে গেলে সনাতন লইল না, বলিল, এক ছুঁচ ওকে আমি দোব না।

প্রভাতীও সহ্য করিবার মেয়ে নয়; মাস খানেক পরে সে পলাইয়া গেল। বাবুদের বাড়ির চাপরাসীটার সঙ্গে—সনাতনের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে সনাতনকে পাওয়া গেল আহত রক্তাক্ত অবস্থায়। বঁটির একটা কোপ তাহার ঘাড়ে বসাইয়া দিয়াছিল। দশ দিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সনাতন বাঁচিল। সে দশ দিন অচেতন সনাতনের কি চীৎকার!

নিশীথরাত্রে ঘুমন্ত মানুষ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিত, সনাতন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ—।

দশ দিন পর চেতনা পাইয়া সনাতন বড়বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বড়বাবু গো! আমি আর বাঁচব না গো!

তাহার সে কাতরতায় বড়বাবুও বিচলিত হইলেন, সনাতন তাঁহাকে

বাঘের মত ভয় করে, আজ সে তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে একান্ত আপন জনের মত।

ছোটবাবুকে সে বলিল, বাঁচি তো আর মেয়ের মুখ দেখব না ছোটবাবু।

সনাতন বাঁচিল।

* * * *

সনাতন বাঁচিল এবং মাস খানেক না যাইতেই আবার সে বিবাহ করিল। অত্যন্ত কুৎসিতদর্শনা একটা মেয়ে। অতুল স্বাস্থ্য এবং আকারে সে সনাতনেরই যোগ্যা। কর্ত্তবাবু সনাতনের নাম দিয়াছিলেন—অসুর, এবার ছোটবাবু সনাতনের নূতন বধূর নাম দিলেন—হিড়িম্বা।

সনাতন অতি সলজ্জভাবে পুলকিত হইয়া হাসিল।

নূতন বধূটিও হাসিল—হি হি করিয়া হাসিল—নির্ব্বোধের মত; সে হাসি দেখিয়া ছোটবাবুর গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল—হাসির সঙ্গে মেয়েটার মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু হিড়িম্বা অদ্ভুত, কিছুদিনের মধ্যেই সে সনাতনকে ঠাকুর করিয়া তুলিল। সনাতনকে সে সকালবেলায় গোয়াল পরিষ্কার করিতে গোবর ঘাটিতে দেয় না, নিজেই সে গোবর পরিষ্কার করে; নন্দর মত সেও ঝুড়ি লইয়া সনাতনের সঙ্গে মাঠে যায়, সেখানে সনাতন ঘুমায়—একা হিড়িম্বা গরু মহিষ আগলায়, গোবর কুড়ায়, কুঁচিকাঠি সংগ্রহ করে, জ্বালানী কাঠ জড়ো করে। জ্বালানী কাঠের জন্য অবলীলাক্রমে সে তালগাছে উঠিয়া যায়। কুঁচি-

কাঠি বিক্রি করিয়া সে পয়সা আনে, বাড়িতে ঘুঁটে দিয়া—ঘুঁটে হইতেও মাসে এক টাকা দেড় টাকা হয়।

সনাতনের অদৃষ্ট! এই হিড়িম্বাও তাহার অদৃষ্টে সহ্য হইল না; অদৃষ্টের তাড়নায় সে নিজেই একদিন দুর্দ্দান্ত প্রহার দিয়া শেষে গলায় হাত দিয়া হিড়িম্বাকে বাহির করিয়া দিল।

হিড়িম্বার সে কি কান্না!

ছোটবাবু মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া গেল।

সনাতন বলিল, সন্দেশের রস রাক্ষসী চুষে মেরে দিলে!

সনাতন কয়েকটা রসগোল্লা কিনিয়া আনিয়াছিল, হিড়িম্বা লোভের বশে গোপনে রসগোল্লাগুলি চুষিয়া খাইতেছিল, সনাতন সেটা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

ছোটবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

সনাতন বলিল, ভাত ডাল যা হয় ঘরে আগে-ভাগে চুরি করে খায়! মারের চোটে আজ নিজেই বলেছে।

ছোটবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আর খাবে না।

তবুও সনাতন অটল। বলিল, উওর এত বড় বাড়, আমাকে 'মর' বলে! আমি মরব! আমি ম'রে যাব ছোটবাবু!

ছোটবাবু হাসিলেন, আবার খানিকটা বিরক্তও হইলেন। 'মর' বললেই কি মানুষ মরে সনাতন?

বার বার ঘাড় নাড়িয়া সনাতন তবুও বলিল, আজ্ঞে না। আমাকে মর' বললে উ!

এবার ধমক দিয়া ছোটবাবু বলিলেন, 'মর' বললে তো হ'ল কি? তুই অমর নাকি? মরবি না তুই?

ছোটবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন বলিল, আপুনি আমাকে 'মর' বলছ ছোটবাবু!

সে এত দিনের মনিব-বাড়ির কাজে জবাব দিয়া সেই দিনই কোথায় চলিয়া গেল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

ফিরিল সে দীর্ঘ দিন পর। আজ হইতে বৎসর খানেক আগে। তখনও সে সমর্থ, এত বড় দেহ আশির উপর বয়সেও প্রায় সোজাই আছে; অল্প একটু নমিত হইয়াছে মাত্র, আর চলিবার গতি মন্থর হইয়াছে।

এক মাথা পাকা চুল, প্রকাণ্ড বড় পাকা গোঁফ, স্থবির অসুরের মত দেহ, সনাতন একেবারে মনিব-বাড়ির অন্দরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। কাছারিতে যাইতে সাহস হয় নাই। এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কি কৈফিয়ৎ দিবে বড়বাবুর কাছে! ছোটবাবুর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

শিবনাথের বধূ শিবনাথের ভগ্নী সকলে বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। সনাতনও হতভম্ভ হইয়া গেল। কাহাকেও সে চেনে না, ইহারা সব কে?

শিবনাথের মা আসিয়া, অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি সনাতন? বালিকা-বয়সে তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি এ বাড়িতে আসিবার পর, বৎসর দুয়েক সনাতন এ বাড়িতে

ছিল ; কিন্তু তবু তিনি তাহাকে চিনিলেন, সনাতনের আকৃতির জন্য।

সনাতন একমুখ হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুণ। একবার গিন্নীমাকে আর বউ-ঠাকরুণকে ডেকে ছান তো। বলেন—সনাতন আইচে।

শিবনাথের মা অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমিই বউ-ঠাকরুণ সনাতন। গিন্নীমা তো নেই।

সনাতন নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই প্রৌঢ় বিধবা—তাহার ছোটবাবুর কচি বউটি! গিন্নীমা নাই! তবে কি, তবে কি—! সে দ্রুত উঠিয়া কাছারি-বাড়িতে আসিল।

শিবনাথ নূতন, নায়েব নূতন, চাপরাসী নূতন, চাকর নূতন—সকলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কে তুমি ?

সনাতন চারিদিক খুঁজিতেছিল। কোন উত্তরই সে দিল না। উত্তর দিলেন শিবনাথের মা। তিনি তাহার পিছন পিছন আসিয়াছিলেন। সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, শিবু, এই সনাতন। সনাতনকে বলিলেন, সনাতন, এই আমার ছেলে।

সনাতন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, বড়বাবু নাই ? ছোটবাবু নাই ?

* * * *

গোয়াল-বাড়ির একখানা খালি ঘরে সনাতন আশ্রয় লইল। শিবনাথের বাড়িতেই অন্নের বরাদ্দ করিয়া দিলেন শিবনাথের মা। প্রথম দিনই পাচিকা ভাত দিয়া গালে হাত দিল। সনাতন ভাত লইল তিন বার। শিবনাথের মা হাসিলেন। সনাতনের আহার এখনও

প্রায় সমানই আছে। খাইতে বসিলে শিবনাথের মা প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ছিলে সনাতন ?

প্রকাণ্ড হাতে বিপুল এক গ্রাস ভাত তুলিয়া সনাতন বলিল, দু তিন জায়গায় মা।

ছেলেপুলে কি ? ঘরকন্না করেছ ?

বাঁ হাতে মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, ছেলে অ্যানেকগুলান মা। তিনটে পরিবারের ছেলে।

আরও তিনবার বিয়ে করেছিল ?

মেয়েরা সকৌতুকে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন বলিল, হ্যাঁ মা। তা সে সব চুকিয়ে দিয়েছি। ছাড়পত্র করে সব তাড়িয়ে দিয়েছি।

সনাতনের এখনকার ইতিহাস এ বাড়ির সকলেই জানে; সনাতন এ বাড়ির কাহিনীর মানুষ। শিবনাথের বোন মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, এইবার আবার ঘর-দোর পাতাও সনাতন। আপন ভিটেতে ঘর কর, বিয়ে কর।

সনাতন নির্ব্বোধের মত খানিক হাসিয়া বলিল, আর লয় মা। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

উদের তাড়িয়ে দিলে কেন বাবা ?

আর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, সবাই মরণ তাকায় মা। মর, মর, মর—ছাড়া বাক্যি নাই, তিনটে বউয়েরই ওই এক রা।

সনাতন তৃতীয় বারের ভাতটা আর শেষ করিতে পারিল না।

ভাতের অপচয়ে লজ্জিত হইয়া সে বলিল, খেতে পারি মা। ই ভাত কটা আমি খাই। তা আজ লারলাম।

সনাতন বাড়িতে থাকিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; মধ্যে মধ্যে গ্রাম প্রান্তর ঘুরিয়া আসিত।

উদাসীর ডাঙায় দীর্ঘ দিন ঘুরিয়াও সে কালকুটিকে দেখিতে পাইল না।

মধ্যে মধ্যে ডাক্তারখানায় গিয়া ওষুধ লইয়া আসিত। তাহার ক্ষুধা হয় না।

আজ কয়েকদিন সনাতন বিছানাতেই শুইয়া আছে। খাবার পাঠাইয়া দিলে অল্প-স্বল্প খায়, না পাইলেও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অভাবও বোধ করে না।

শিবনাথের মা এ অঞ্চলের প্রবীন বিচক্ষণ ডাক্তার ননীবাবুকে ডাকাইয়াছিলেন। ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালরোগ।

শিবনাথ দেখিতে গেল।

কঙ্কালসার সনাতন জীর্ণ পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক পাষাণ-দুর্গের মত পড়িয়া আছে। মোটা মোটা হাড়গুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাহিয়া আছে। শিবনাথের মা সেখানে ছিলেন, তিনি ডাকিতেছিলেন, সনাতন! সনাতন!

সনাতন যেন শুনিতে পাইতেছে না।

শিবনাথ কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, সনাতন! সনাতন!

এবার সনাতনের দৃষ্টি ফিরিল সে দৃষ্টি যেন কিছু খুঁজিতেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সনাতন!

এবার দৃষ্টি শিবনাথের দিকে রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না। সে হাতের ক্ষীণ ইঙ্গিতে ডাকিল, আরও কাছে এস। শিবনাথ সরিয়া গেল।

খোকাবাবু!

হ্যাঁ। কেমন আছ?

ভাল আছি।

কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

ঘাড় নাড়িয়া সনাতন জানাইল, কিছু না। তারপর ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না ভাল, শুনতি পেছি না।

শিবনাথের মা এবার বলিলেন, ভয় নেই সনাতন। সেখানে তোমার নন্দ আছে, কর্ত্তাবাবু আছেন, বড়বাবু আছেন, গিন্নীমা আছেন, ছোটবাবু আছেন—

সনাতন কাহারও সন্ধানে কোন দিকে চাহিল না—শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, অন্নকার!

অর্থাৎ অন্ধকার।